দেয়াল

জাহান আক্তার নূর

দেয়াল

জাহান আখতার নূর

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা - চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

দেয়াল

জাহান আখতার নূর

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ১৯৯৬ইং

দ্বিতীয় প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০১১

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

স্বত্ব ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রচ্ছদ

ডিজাইন ওয়ান

পল্টন টাওয়ার

৮৭ পুরানা পল্টন লাইন (৮ম তলা) ঢাকা

ফোনঃ ৮৩৫০৮৪৫, মোবাইলঃ ০১৭৩০১৭৭৫৫৫

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

DEYAL, Written by : Zahan Akhtar Nur, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk. 100.00 US :3/-

ISBN 984-493-007-7

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

লেখিকা জাহান আখতার নূর মূলত একজন গৃহিনী হলেও তার লেখায় সমাজ সচেতনা ও এক প্রাগ্রসর সমাজের জটিলতা মূর্তমান। 'দেয়াল' এই গল্প সংকলনটিতে নয়টি ছোট গল্প স্থান পেয়েছে। মানব-মানবীর নিগুঢ়তম সম্পর্কের জটিলতা, চিরন্তন প্রেম, প্রেমহীনতা ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রতিটি গল্প স্বকীয় স্বাতন্ত্র নিয়ে দীপ্তমান। গল্পগুলোর পান্ডুলিপি পড়ে আমি চমৎকৃত হই এবং একে বই আকারে প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করি।

সাংসারিক জীবনের চার দেয়ালের মধ্য হতে তার অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জীবনকে যেমন দেখেছেন তারই বিশ্বস্ত রূপায়ন এই 'দেয়াল'। লেখিকার রচনায় সংকলনের 'নারী' চরিত্রগুলোর চাওয়া-পাওয়া, কামনা বাসনা এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ বইখানা ১৯৯৬ সালে প্রকাশ করা হয়। পাঠক পাঠিকাদের উত্তরোত্তর চাহিদা পূরনে সোসাইটি বইখানার দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশ করা হলো।

আশা করি, এই গল্প সংগ্রহ সুধী মহলে সমাদৃত হবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

লেখিকার কথা

আমার চারপাশে যে জীবন প্রবাহ নিরন্তর বয়ে চলেছে, আদিকাল হতে সৃষ্টি বিধাতা মহত্ত রঙ তুলিতে নিসর্গের ক্যানভাসে প্রতিনিয়ত যে অনুকরণীয় বিশ্ব সংসারের জীবন্ত ছবি এঁকে চলেছেন তার প্রতিবিম্ব প্রতিচ্ছবি কত জ্ঞানী-গুণীজন কত আদিকাল হতে মনের মাধুরী মিশিয়ে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই সৃষ্টিশীলতার কাজে কেউ সার্থক হচ্ছেন, কেউ ব্যর্থ হচ্ছেন। তবু থেমে নেই এই প্রচেষ্টা। মানব মনের আকুতি উপলব্ধির ব্যাকুলতা, আপনাকে বহুর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা রোধ করা শিল্পীর জন্য দুঃসাধ্য।

সংসার জীবনের চার দেয়ালের সীমাবদ্ধতায় জীবনকে যেভাবে দেখেছি তারই খন্ড চিত্র এ গল্পগুলো। জীবনকে পুরোপুরি রূপায়িত করার ধৃষ্টতা আমি দেখাই নি। কল্পনা ও বাস্তব উপলব্ধি নিয়েই শিল্পীর জগৎ। আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

মানুষের জন্য মানুষের মনে দয়া, প্রেম, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জাগানোর প্রত্যাশায় আমার কলম ধরা। এই লেখাগুলো পাঠক হৃদয়ের কতটুকু স্পর্শলাভ করবে জানিনা । তবু তাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির প্রত্যাশায় লেখাগুলো প্রকাশকের হাতে যেমন তুলে দিয়েছি-তেমনি পাঠকের কাছেও।

জাহান আখতার নূর

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যারা মূঢ় বেদনায়
নিরব অশ্রু ফেলে
যারা চার দেয়ালের
নিরেট অন্ধকারে
কাঁটা ও ফুলের
একান্ত অভিসারে
নারী জীবনের
মহিমা বিকশি চলে।
তাদের জন্যে
আমার এ আত্মগাঁথা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সাধনা / ০৯

দখিনা বাতাস / ১৬

প্রত্যাবর্তন / ২৮

প্রতিদান / ৩৭

ভিন্নস্রোত / ৫০

আশ্রয় / ৬১

জনম জনম ধরে / ৭১

অচেনা সুখ / ৮০

দেয়াল / ৮৬

www.pathagar.com

দেয়াল

www.pathagar.com

সাধনা

আমি আমার অফিস রুমেই বসেছিলাম।

বাইরে হেমন্তের সোনা ঝরা সকাল। এক টুকরো রোদ জানলা গলে আমার পায়ের উপর পড়ে মিষ্টি উষ্ণতা ছড়াচ্ছিলো বাইরে স্কুলের বাগানে মৌসুমী ফুলের ভীড়। বাগানের মাঝখানে লাল সুরকী ছড়ানো পথ। পথের দু'ধারে তরুণ কৃষ্ণচূড়ার সজীব উপস্থিতি। ডালপালা ছড়িয়ে বেশ বড় হয়েছে কিন্তু ফুল আসতে এখনও অনেক দেরি।

লাল কৃষ্ণচূড়ার সাথে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সাথে কোথায় যেন একটি সম্পর্ক ছিল। ইদানিং ফেব্রুয়ারীতে কৃষ্ণচূড়া ফোটেনা। আর কিছুদিন পর একুশ আসবে। হৃদয়ের আঙিনায় কৃষ্ণচূড়া ফুটবে লাল টকটকে হয়ে। বায়ান্নর একুশ দেখিনি বলে দুঃখ পেতাম। আবার সূক্ষ্ম আনন্দ পেতাম বায়ান্নতে জন্ম বলে। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মনে হতো কতো বড় বীর। কি ঐতিহাসিক চরিত্র! কি সৌভাগ্য! মরেও অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল। তখন ভাবিনি আরও রক্ত ঝরাতে হবে বাঙালীকে, দেশমাতৃকার ঋণ শুধতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে। একুশের পর উনসত্তর আসবে। আসবে একাত্তর তারপরেও বাঙালীর রক্ত দান শেষ হবে না–আরও কত সাল সংখ্যা অমর হয়ে রইবে বাঙালীর বুকে, কে জানে। এখন এই মধ্য যৌবনে মনে হয় যারা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেনি, যারা নেহায়েত শিশু ছিল তাদের কি আমার মতো তেমনি দুঃখ হয়? তারা কি আমাদেরকে ঈর্ষা করে? তারা কি ভাবে–কি দুর্দান্ত সাহস নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে। কি মহৎ কাজে তারা অংশ নিয়েছিল প্রতিদানের আশা না রেখে?

–জানি না, কই কেউতো তেমন করে শুধোয় না? কেন তাদের কৌতুহল জাগেনা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, স্বাধীনতার গৌরব গাঁথা শোনার।–হৃদয়টা অকথিত বেদনায় মথিত হচ্ছিল।

পাশের রুমের কয়েকজন শিক্ষক মিলে ছাত্র ভর্তির ঝামেলা সারছিলেন। এই মাসটা ভর্তির ব্যাপারে স্কুল সরগরম থাকে। আমার তেমন ব্যস্ততা না থাকায়

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা একটি বই নিয়ে বসেছিলাম। এমন সময় একটি বাচ্চা ছেলের হাত ধরে যিনি প্রবেশ করলেন তাকে দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। অস্ফুট স্বরে বলে ফেললাম,

–তনিমা তুমি?

চমকিত বিস্ময়ে তনিমা হতভম্ব,

–তুমি ...তুমি এখানে!

বিশ বছরের পুরনো স্মৃতি মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো হৃদয়ের ঘননীল আকাশে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ক্লাশের সেই দিনগুলো। ভার্সিটি করিডোরে তনিমার সাথে প্রথম সাক্ষাত। একাত্তরের রণাঙ্গন, বিজয়ের দিন শেষ দেখা। সব অবিশ্বাস্য দ্রুততায় স্মৃতিপটে জেগে ওঠে। তনিমা বদলায়নি তেমন। তাই চিনতে কষ্ট হয়নি। অপ্রত্যাশিত দেখার ধাক্কা সামলাতে জোর করে সহজ হতে চাইলাম,

–কেমন আছো তনিমা?

তনিমা বিহ্বল চোখে আপ্রাণ চেষ্টায় সে শক্ত করে টেবিলের কোণটা চেপে ধরেছে। ওর কষ্ট আমি দেখতে পারছিলাম না–আমার ভিতরে ভাঙচুর হচ্ছে। কি আশ্চর্য! বিশ বছরের পুরনো স্মৃতি এখনও এতটা সজীব থাকে কি করে? বৃষ্টির ফোটায় ভেজা পত্র পল্লবের মত আমার মৃত হৃদয়টা জেগে ওঠে।

–তনিমা আমি কি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি!

আমি উঠে গিয়ে চেয়ার সরিয়ে ওকে বসতে সাহায্য করি।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দ থেকে তনিমা মুখ তোলে। ওর দু'গাল ভেসে যাচ্ছিল চোখের জলে। মৃদু ফোঁফানি বেরুচ্ছিলো ওর মুখ দিয়ে। আমি বিব্রত বোধ করছিলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল ছেলের হাত ধরে।

–দুঃখিত, আমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছি---চল স্বাধীন।

আমি স্বাধীনের হাত ধরে কাছে টানলাম। চার-পাঁচ বছরের ছেলে-মিষ্টি চেহারা।

www.pathagar.com

–স্বাধীন ওই আলমারিটার দিকে তাকাও। দেখো কতো মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা আছে। সে বেশ কৌতুহল নিয়ে এগিয়ে গেলো আমার কথা শুনে।

তনিমার চেহারা হতে বেদনা সরে গিয়ে ক্রোধ জেগে ওঠে।

–বিশ বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি। রাযাকারের মেয়ের সাথে কথা বললে আপনার অপমান হবে না?

বড় দুঃখে হাসি উঠে আসে ঠোঁটে।

–না, তনিমা এখন অনেক কিছুতেই আগের মতো অপমান হয়না। অপমান সইতে সইতে মান–অপমান জ্ঞানটা খোয়া যাবার উপক্রম হয়েছে। আর রাযাকারের কথা বলছো,. এখন কি রাযাকার বললে কেউ অপমানিত হয়? রাযাকার শব্দটিতে কি আগের মতো–শহীদের রক্ত, মা–বোনের লাশের গন্ধ, পিতা ও ভ্রাতার অস্থি করোটির শূন্যতা পাও? শব্দটির অর্থ পাল্টে গেছে। এখন রাযাকার অর্থ মুক্তিযোদ্ধা আর সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শত্রু।

–আজও কি তুমি আমাকে অপমান করবে?

–না তনিমা। তোমাকে অপমান করি সে সাহস আমার কোথায়? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সব কাপুরুষ হয়ে গেছি। অস্ত্র ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ করার আর ভালবাসার হৃদয়টাও দান করে ফেলেছি। এখন আমরা কোন কিছুতে গর্জে উঠিনা, প্রতিবাদী হইনা। আমরা এখন বিলীন হয়ে যাচ্ছি। থাক ওসব কথা। তোমার কথা বলো–কেমন ছিলে, কেমন আছো? বর কি করে? কোথায় থাকো?

–এতদিন পরে হঠাৎ এ উদারতা কেন? যার উপর বুকভরা ঘৃণা নিয়ে দেশান্তরী হয়েছিলে তাকে সামনে পেয়ে আঘাত হানাটাই ত উচিত।

–তনিমা আমার জীবনটাকে '৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বলি দিয়েছি। সে আমি'র সাথে আমার ভালবাসা, আমার জীবন, আমার বাবা–মা সবার কবর হয়েগেছে। এ আমি সেই আমি'র প্রেতাত্মা। আমাকে আঘাত করে কি লাভ তোমার তমা?

– আমি তোমাকে ক্ষমা করিনি করবোও না। বলতে বলতে তনিমা উঠে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

– যেওনা, বসো। আরেকটু বসো। অনেকদিন পর দেখা, ভাল লাগছে।

– ভালবাসা আর বসবার দিন তো সে বিশ বছরের অতীত। অতীত কখনো বর্তমান হতে পারে না।

– অতীত বর্তমান হয় না সত্যি কিন্তু স্মৃতিতো হতে পারে।

এখন তুমি তো আমাকে রাযাকারের মেয়ে বলে ঘৃণা করবে। কিন্তু জেনে রেখো, আমার বাবা রাযাকার হতে পারে, আমি ত কোন দোষ করিনি। নয় মাস আমিও পালিয়ে বেড়িয়েছি। তোমাদের সাহায্য করেছি, তবে কেন ফিরিয়ে দিলে বারবার?

– তনিমা সে কথা থাক। ও তুমি বুঝবে না, বুঝতে যদি আমার মতো নিজের বাবা, মা ও বোনকে হারাতে, যদি তোমাদেরও ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতো পরিচিত কেউ?

যদি সর্বস্বান্ত হতে–লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার মতো, তাহলে বুঝতে কি জ্বালা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি। কি মর্মান্তিক দুঃখে জীবনের কাছ হতে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তনিমা, তোমার বাবা আমাদের সম্পর্কের কথা জানা সত্ত্বেও আমার বাবাকে ধরিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন নি। নিরীহ একজন সত্যনিষ্ঠ স্কুল শিক্ষককে হত্যা করলেন পুত্রের মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার অপরাধে। আমার একমাত্র বোনকে জোর করে ধরে নিয়ে লম্পটের সাথে বিয়েতে বাধ্য করা হয়েছে। এ কেমন প্রতিশোধ? কেমন বিচার? একজনের অপরাধে পরিবারের সবাইকে মরতে হবে কেন? কি অপরাধ ছিল আমার? আমার মতো লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার ? নিরীহ জনসাধারণ অতর্কিতে ঘুমন্ত অবস্থায় যখন আক্রান্ত হয় শত্রুর বুলেটে, তখন প্রতিবাদ করা কি অন্যায়? মা বোনের ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া কি অন্যায়! তনিমা আমরা যাদেরকে বিশ্বাস করে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলাম তারা যখন আমাদেরকে কুকুরের মত গুলী করে মারছিলো তখন এ দেশেরই একদল মানুষ তাদের সাহায্য করেছে আর আমরা তাদেরই স্বজন হয়ে প্রতিবেশী হয়ে, দেশবাসী হয়ে, তাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছি। তনিমা পাকিস্তানীদের স্বার্থ বুঝতে পারি।

www.pathagar.com

বুঝতে পারিনা তাদের দালালদের মনোভাব। স্বাধীনতার বিশ বছর পরও তাদের মনোভাব অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

–কায়সার তুমি কি এখনও আমাকে ঘৃণা করো? তোমার কি একবার মনে পড়েনি আমার কথা, আমি কিভাবে বাঁচবো কোথায় থাকবো? তুমি বাবার অপরাধ দেখলে আমার মন দেখলে না।

–সব জানার পর সেদিন আমার বুকে কি আগুন জ্বলে উঠেছিল সে তুমি কি করে বুঝবে তনিমা! তুমি তো পুরুষ নও।

–আমি নির্বোধও নই। আমি জানি রাযাকারের মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার বীরত্বে কলঙ্ক লেগে যেতো বলে তুমি আমাকে প্রত্যাখান করেছিলে? কিন্তু কায়সার, যে তোমার পিতাকে হত্যা করেছে, বোনকে লম্পটের হাতে তুলে দিয়েছে তাকে হত্যা করলে আমি কখনো তোমাকে দোষ দিতাম না। আমি আমার পিতৃ ঋণ শোধ করতে পারতাম।

আমার ভিতরটা ভালাবাসায় ও ঘৃণায় বার বার প্লাবিত হচ্ছিল। স্মৃতি অমলিন কিন্তু সময় ধাবমান। এই বিশ বছরে তনিমার জীবনে কতো পরিবর্তন এসেছে, সে সব ত অস্বীকার করা যায় না। তবে কেন হৃদয়ের গ্রন্থি বাড়িয়ে যাই।

–ওসব কথা থাকনা তনিমা, বর্তমানের কথা বলো।

তনিমা হাসল।

–আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবই তুমি। তোমার সাথে আবার দেখা হবে বলে বেঁচে আমি। তোমার ধারণা পাল্টে দেবো বলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। তুমি খুব নিষ্ঠুর কায়সার! একজন বড় যোদ্ধা বলে বড্ডো অহংকার তোমার না?

– ছি! তনিমা, অহংকার করার মতো কোন সঞ্চয় আমার নেই। আর বড় যোদ্ধা? না তার সম্মানও রাখতে পরিনি আমার সহযোদ্ধাদের কাছে, নিজেকে ছোট করে ফেলেছিলাম বলে পালিয়েছিলাম সকলের কাছ হতে।

– কি করেছিলে আমায় বলবে? তনিমা কৌতুহলী হলো।

– শুনতে চেয়োনা তোমার ভাল লাগবে না।

www.pathagar.com

– সত্যি কথা ভাল না লাগলেও কিছু এসে যায় না। বলো।

– তুমি ত সব জানো শুধু একটি কথাই জানতে না রাযাকারদের নেতা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে নিজের হাতে গুলী কারার অর্ডার হয়েছিলো আমার উপর। সব ঠিক ছিলো। তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিলো কিন্তু আমি পারিনি তনিমা। আমার ঘৃণা হয়েছিলো, তীব্র ঘৃণা। শত্রুর চেয়েও ঘৃণ্য সেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করতে আমার হাত সাড়া দেয়নি। বাবার বয়সী একজন বৃদ্ধ পাপীকে হত্যা করতে পারিনি বলে তার মাশুল আজও দিয়ে যাচ্ছি। আমার বাবা মা বোনের আত্মা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়–'খোকা তুই বিচার করলিনে?'

তনিমা জ্বলে ওঠে।

–তুমি অন্যায় করেছিলে কায়সার! তোমার মারতে পারা উচিত ছিলো। তাহলে আজও তোমাকে হাহাকার নিয়ে বেড়াতে হতো না। আমারও ঠিকানা বদলে যেতোনা। তনিমার দুচোখ জলে ভরে যায়।

–কায়সার' রাযাকারের পরিচয় মুঝে ফেলার জন্য আমি এক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে বিয়ে করেছি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ?

–কাকে, কি নাম?

–রফিক!

অত্যন্ত মমতা মাখা একটা নাম আমার বুকের পাঁজর স্মৃতিতে ভরে দিল।

আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল রফিক। দারুণ সাহসী ও সরল স্বভাবের রফিকদের ব্যাচকে আমি ট্রেনিং দিয়েছিলাম। খুব প্রিয় একজন আর এক প্রিয় মানুষকে পেয়েছে। সুখের কথা। আপন মনে সগোতোক্তি করি।

প্রকাশে বলি।

– খুব ভাল কাজ করেছ তনিমা। জীবনকে নিষ্ফল রাখতে নেই। তোমাদের জীবন ভরে উঠুক। আমার ত কেউ নেই। তোমাদের সন্তানদের ভিতর আমি বাঁচতে চাই। অনেক কষ্ট করে, সাধনা করে স্কুলটি দাঁড় করিয়েছি। সমস্ত জীবন ধরে আমি সাধনা করে যাব একটি দুটি করে হলেও আমি যেন সৎ মানুষ গড়তে পারি।

www.pathagar.com

তনিমা রুমালে ভেজা চোখ মুছে মিষ্টি হাসে।

– কায়সার ভাই, আমার বাসায় যেও। আমি এখানকার গার্লস স্কুলে জয়েন করেছি। জানো ত আমার স্বামীর একটা পা নেই। ওর দৃষ্টিশক্তিও আস্তে আস্তে কমে আসছে। তাতে কি? কাউকে না কাউকে স্বাধীনতার মূল্য ত জীবন দিয়ে শোধ করে যেতে হবে। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি ওকে স্বাভাবিক রাখতে, ওর মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখতে। তোমাকে পেলে খুব খুশী হবে।

স্বাধীন ছুটে আসে।

মা আমার সব দেখা হয়ে গেছে এবার চলো...।

তনিমা বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে। আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে যায় স্মৃতির গভীরে।

www.pathagar.com

দখিনা বাতাস

এবারের আলোচিত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে আমেরিকায়। আমেরিকার জনগণ ফুটবলপ্রেমী নয়, এ ধরনের মন্তব্য আগে শোনা গেলেও এবার খেলার মাঠে দর্শকের উপস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে ফুটবলের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করেছে। হয়তোবা আগামীতে জনসাধারণের একটি বিশাল অংশ ফুটবলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়বে। যাহোক আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের সময়ের বেশ ফারাক থাকাতে অধিকাংশ খেলাগুলো রাত্রেই দেখানো হচ্ছে। রাত সাড়ে দশটা থেকে ভোর চারটা। কখনো বা সকাল আটটা অবধি খেলা চলছে।

ফুটবল বাঙালীদের অন্যতম পছন্দের খেলা। এই পছন্দটা কখনো কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে পাগলামির পর্যায়েও পড়ে যায়। সুযোগ থাকলে ব-দ্বীপ অঞ্চলের গরীব সামর্থ্যহীন দর্শকরা হয়তো আমেরিকা ষ্টেডিয়ামের দর্শকদের হটিয়ে নিজেরা বসে যেতো। আর তাই, সে সুযোগ নেই বলেই টিভি পর্দার সামনে বসে-শুয়ে দেখে নিজেদের অভিলাষ চরিতার্থ করছেন। এদের মধ্যে শাকিল আহমেদ একজন। এক কালের তুখোড় ফুটবল খেলোয়াড় শাকিল আহমেদ-বর্তমানে নিজেকে ফুটবল প্রেমী হিসাবে টিভি দর্শকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁর অদম্য বাসনাকে চরিতার্থ করছেন। বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা তার এক ঘেয়ে নিরানন্দ জীবনে কদিনের জন্য ব্যতিক্রমী আনন্দের সম্ভার বয়ে এনেছে।

পঞ্চাশোত্তীর্ণ শাকিল আহমেদ চাকুরী জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও জীবনের সকল দাবী-দাওয়া মিটাতে পারেননি। তিনি নিজে সৎ মানুষ।

চাকুরী জীবনে তার সততার ছায়া উন্নতির সোপান না হয়ে প্রায় অন্তরায় হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে দীর্ঘদিন দেন-দরবার করেছেন। লেখালেখি, অভিযোগ, পাল্টা-অভিযোগ করেও তার পদন্নোতি হয়নি। হয়তোবা আশেপাশে যেসব কাকের মত ময়লা খাওয়া স্বভাব নিয়ে ভদ্র সন্তানেরা বড় পদ দখল করে আছেন তাঁদের সামনে কিছু পচা অন্ন, মানে ঘুষ প্রদান করতে পারলে

www.pathagar.com

হয়তোবা তার ইপ্সিত পদটি পেলেও পেতে পারতেন। কিন্তু কি এক প্রচন্ড জেদে ইচ্ছে করে এ কাজটি তিনি করেন নি।

ঘরে তিনটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ও স্কুল-কলেজে পড়ুয়া দুটি পুত্রসন্তানের সুবিশাল বোঝা প্রায় নীরবে বহন করে চলেছেন তিনি। তিনি অভিযোগ জানান না। হা-হুতাশ করতে ভালবাসেন না। শুধু কখনো কখনো তাঁর মনে হয় এই চির পরিচিত চেনা পরিবেশে ঠান্ডা শীতল হাওয়ার বড় অভাব। কিছু আনন্দিত মুহূর্ত অথবা হারানো যৌবনের উচ্ছল দিনগুলি যদি আচম্বিতে ফিরে পেতেন! যদি জীবনটাকে আবার নতুন করে শুরু করতে পারতেন তা হলে কতই না ভাল হতো!

শাকিল সাহেবের এসব নিভৃত ভাবনার কোন সঙ্গী নেই। তিনি নিয়ম ও সময় মেনে অফিসে যান। ঘড়ি ধরে খেতে বসেন, ঘুমাতে যান, ঘুম থেকে ওঠেন। তাঁর একমাত্র বিনোদন টিভির সব খেলাগুলো দেখা। নিতান্ত সাধারণ মানুষের সাদামাটা জীবন!

এহেন সাধারণ মানুষটি হঠাৎ বদলে গেলেন। তাঁর এই বদলে যাওয়া কেউ লক্ষ্য করেনি কারণ বাইরে কিছুই পাল্টায়নি। বদলে গেছে তার ভিতরটা-তার নিভৃতচারী হৃদয়টা রঙে রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে নিজের পরিবর্তনটা নিজে টের পেয়েছেন। তিনি নিজের মধ্যে এক ধরনের শক্তি খুঁজে পাচ্ছেন। সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছেন। বর্তমানের ক্লিষ্ট জীবন যে বেশী দিন যাপন করতে হবে না তা ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। জীবনটাকে হঠাৎ করে ভারহীন স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে।

পুরুষ মাত্রই নিজেকে হিরো হিসেবে দেখতে চায়। তিনিও ব্যতিক্রম নন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তিনি একজন ব্যর্থ পুরুষ। অনেকে তাঁকে প্রচলিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে না দেখে গো-মূর্খ ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। এসব তিনি বেশ ভালভাবে টের পান। টের পেলেও তাদের ধারণাকে পাল্টে দেবার মত কোন পদক্ষেপ কিংবা কোন বক্তব্য রাখতে তাঁর রুচি হয়না। তারা যেমন তাঁকে করুণা করেন, মনে মনে তিনিও তাদের করুণা করতে ছাড়েন না। অন্যায় ও লোভের পঙ্কিলতায় নিজেকে ভাসিয়ে দেননি বলে এক ধরনের গোপন আনন্দ আছে তাঁর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ

www.pathagar.com

আনন্দের কোন শরীক নেই। কেউ কখনো বলেনি, 'শাকিল তুমি এক অজেয় পুরুষ। কি করে পারলে মরা লাশের ভোজের টেবিল হতে নিজেকে দূরে রাখতে!' কেউ বলেনি। দেয়নি এতটুকু সাধুবাদ। শুধু দিনের পর দিন তার অক্ষমতাকে তার চোখের সামনে তুলে ধরেছে সুকৌশলে। কখনো সখনো তাঁর স্ত্রী আয়েশাও। তিনি যন্ত্রণা পেয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন গোপনে। কিশোর অভিমান বুকে পুষে রেখেছেন–কেউ আমাকে চিনল না, জানল না।

হঠাৎ করে জুলেখার আর্বিভাব তাঁকে আমূল বদলে দিল। জুলেখা কখন ধীরে ধীরে তার সকল ব্যর্থতাকে জয়ের মালা পরিয়ে তাঁকে চিরদিনের মত অভিষিক্ত করল। অন্য কেউ তো দূরের কথা তিনি নিজেও তা টের পেলেন না। সম্ভবতঃ বিশ্বকাপ ফুটবলই এই জয় পরাজয়ের ব্যাপারটা নিশ্চিত করে তুলেছিল।

বছর খানেক আগে জুলেখা তাঁরই অফিসে জয়েন করেছিল। এই দীর্ঘ দিনে মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কিছুই ঘটেনি, জুনিয়র কলিগই বলতে গেলে। আলাপ ছিল ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবলের আলোচনা তাঁদের দুজনকে এক ভিন্ন প্রেক্ষিতে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। পুরনো মানুষ পুরনো পরিচয় হঠাৎ নতুন মোড়কে অভিনব হয়ে উঠল। যেন গ্রীষ্মের দাবদাহে শুকিয়ে যাওয়া গাছের পাতাগুলো বর্ষার জল সিঞ্চনে নবীন পত্রপল্লবের মত সজীব হয়ে উঠল।

শাকিল আহমদের মনের গভীরে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া যৌবন নদী হঠাৎ বর্ষার উচ্ছাসে প্লাবিত হচ্ছে বার বার। তার ভিতরটা আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। জীবন আর দুর্বহ মনে হচ্ছে না। পৃথিবীটা সুন্দর আর রমনীয় মনে হচ্ছে। না, তিনি প্রেমে পড়া যুবকের মত অধীর হয়ে পড়ছেন না। তিনি একটি শান্ত দূরত্বের মধ্যে নিজেকে রেখে এই আশ্চর্য সুন্দর সম্পর্ক রসিয়ে রসিয়ে অনুভব করতে চাচ্ছেন। জুলেখার সহমর্মিতা ও সপ্রশংস দৃষ্টি তাঁকে মুগ্ধ করেছে। চাকুরীজীবি মহিলাদের প্রতি তার অনীহা জুলেখা ভেঙে দিয়েছে। তিনি জুলেখাকে সম্মান করেন। পছন্দ করেন।

দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্বকাপ খেলা এখন শেষ পর্যায়ে। শাকিল আহমেদের পছন্দের টিমই জুলেখার পছন্দের টিম। তার পছন্দের খেলোয়াড়রাও

www.pathagar.com

জুলেখার প্রিয় খেলোয়াড়। জুলেখাও রাত জেগে খেলা দেখে, যা শাকিল আহমেদকে অবাক এবং কৃতজ্ঞ করে। কোন মেয়ে রাত জেগে খেলা দেখছেন! এটা জানলে কোন পুরুষের মনে কৌতুহলের ঢেউ উঠবে না? শাকিল সাহেব মুগ্ধ এবং প্রশান্তির হাসি হাসেন। এতদিনে একটি চমৎকার মেয়েকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। এ মেয়ে-হোকনা বিবাহিতা, হোক না সন্তানের জননী। তবু এ মেয়ে অনন্যা। এর সাথে বন্ধুত্ব হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

শাকিল সাহেব রাত জেগে খেলা দেখেন। তারপরও সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরে সময়মত অফিসে আসেন। যুবকের অদম্য প্রাণশক্তি তার কাজকর্মে তাঁর টেবিলে কোন ফাইল জমেনা। প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন সেরে রাখাই হলো তার নীতি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সহকর্মীরা আসে, বসে গল্প করে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যায়। জুলেখাও আসে। মিষ্টি করে হেসে যখন দরজার পর্দা তুলে বলে আসতে পারি? শাকিল আহমেদের বুকের ভিতর রিন রিন করে বেজে ওঠে আনন্দের নুপুর-আসুন।

প্রায়ই কোন না কোন কাজ নিয়ে আসেন জুলেখা। শাকিল আহমেদের দিকে মিষ্টি হেসে কাগজটা বাড়িয়ে বলেন।

-দেখুন ত শাকিল ভাই আমার লেখাটা ঠিক হয়েছে কিনা!

কিংবা কোনদিন বলেন,

-আপনার হাতের লেখা অমন মুক্তোর মত নিটোল সুন্দর হয় কি করে?

কোনদিন বলেন-শাকিল ভাই, এমন চমৎকার ইংরেজী আপনি কি করে লেখনে। আমার লেখাটা একটু কারেকশন করে দিন না? শাকিল আহমেদ হাসেন। গর্বে তার বুক ভরে ওঠে। মৃদু হেসে বলেন,

- রেখে যান পরে দেখে দেবো। এখন বলুন, কি খবর। আপনার কর্তাটি খেলা-টেলা দেখেন?

- জুলেখা অদ্ভুদ ভ্রুভঙ্গি করে বলে, উহু ওর এসব সখ নেই। তারপর মুখটা করুণ বিষন্ন করে বলে-কি লোককে নিয়ে ঘর করছি-যদি জানতেন, শাকিল ভাই। সারাদিন অফিস করে ঘরে গিয়ে দেখি কর্তা আমার আগেই পৌঁছে

www.pathagar.com

খাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে আবার আমি যখন খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিতে আসি তিনি তখন বৈকালিক ভ্রমণে বেরোচ্ছেন, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে সাতটা সাড়ে সাতটার ভিতরে রাতের খাবার শেষ করা চাই তার। এরপর সাড়ে ন'টার ভিতরে ঘুমোতে চলে যান। সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে বাচ্চার যত্ন নিয়ে ওর সাথে কথা বলার সময় আমি পাইনে। এমনি ঘুম কাতুরে টাইম মেশিন লোকটা। জুলেখা বলতে বলতে হেসে ওঠে।

শাকিল সাহেবের বুকে করুণার নদী ছল্ ছল্ করে বয়ে যায়–আহা এই বয়সে স্বামীর সাথে এই দূরত্ব! একে না জানি কতইনা আহত করছে। এর স্বামীর সাথে আমার স্ত্রীর খুব মিল দেখছি।

স্ত্রী–আয়েশা বেগমেরও দিবা নিদ্রার অভ্যাস। কোনদিন কোন জরুরী কাজের ঝামেলায় ঘুমোতে না পারলে ভীষণ মেজাজ করতে থাকেন। ওদিকে আবার রাত দশটা বাজতে না বাজতে মশারী ফেলে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। শাকিল সাহেবের স্ত্রী দিবা নিদ্রাটা যদিওবা সহ্য হয় কিন্তু ওই দশটার ভিতর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়াটা তার জন্য অসহ্য বিরক্তিকর।

সরকারী কোয়াটারগুলোর রুমের সংখ্যা এমনিতে অপ্রতুল, তার মধ্যে লোকসংখ্যাও অনেক। ড্রইং রুমে ছেলে, দ্বিতীয় শোবার ঘরখানায় মেয়েরা লেখাপড়া করছে। বাকী থাকে খাওয়ার ঘর, রান্নাঘরের লাগোয়া খাওয়ার ঘরে অবিরাম কাজের মেয়েটার আনাগোনা, তার থালাবাসনের ঝনৎকার ও ট্যাপের পানি পড়ার ছর ছর শব্দ, ক্ষণে ক্ষণে ছেলেমেয়েদের পানি খেতে আসা। এসব প্রিয় কোন বই পড়া অথবা জরুরী কিছু লেখার মনোযোগকে ব্যহত করতে অতি উত্তম অস্ত্র। তারপরও অসুস্থ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে এসব অত্যাচার তিনি বছরের পর বছর সহ্য করে এসেছেন।

শাকিল সাহেবের মনে হয় বিয়ের সময় তিনি বিরাট ভুল করেছিলেন কনের ডাক্তারী পরীক্ষা না করিয়ে । তখন কি যে চোখ–মন ছিল...ওই হাল্কা পাতলা গড়নের শ্যামলা মেয়েটির ভিতর অত রাজ্যের অসুখ বাসা বেধেছিল বুঝতেই পারেন নি। এখন তা বলতে গেলে আয়েশা বেগম ঢোড়া সাপের মতন ফোঁস করে উঠেন।

www.pathagar.com

–কি আমি বাপের বাড়ী থেকে রোগ নিয়ে এসেছি। ছিঃ বলতে তোমার মুখে আটকালনা! ওই একঝাক ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে গিয়ে না আমার এ দশা হয়েছে, তা কোন দিন ভেবেছ?

কি জানি, শাকিল সাহেব চিন্তিত মুখে ভাবেন। কত জনের ত সাতটা আটটা করে ছেলে মেয়ে। তার ত মোটে পাঁচটা। তাইতে স্ত্রীর এই দশা! কপাল আর কাকে বলে।

জুলেখা বেগমের মুখের করুণ আভা দেখে এক পলকে কত কথা ধেয়ে এল মনে। জুলেখা বেগমের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকান। ঢল ঢল লাবণ্যভরা মুখ। তারপাশে চকিতে স্ত্রীর শীর্ণ মুখের ছায়া ভেসে উঠে মিলিয়ে গেলো। শাকিল আহমেদের হঠাৎ করে স্ত্রীর বলা কথাগুলো কানে ভেসে আসে। এতগুলো ছেলেমেয়ের জন্ম দিতেই না তার শরীরের এই দশা! তাহলে কি জুলেখাও একদিন অধিক সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে আয়েশা বেগমের মত ফুরিয়ে যাবে? জুলেখাকে কি সাবধান করে দেওয়া যায় না? কিন্তু কিভাবে! এ ব্যাপারে কি করে জুলেখা বেগমের সাথে কথা বলবেন? এ ত একান্ত ব্যাক্তিগত ব্যাপার। জুলেখাও তার স্বামীর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে শাকিল আহমেদের কি ভূমিকা! তিনি কে! তবু...তবু...শাকিল আহমেদ ব্যাকুল চোখে তাকান জুলেখার দিকে। জুলেখা শাকিল আহমেদের চোখে অনুসন্ধিৎসা দেখতে পেয়ে হেসে জিজ্ঞেস করে,

– কি ব্যাপার আপনাকে হঠাৎ চিন্তিত দেখাচ্ছে....? এনিপ্রোব্লেম? নড়ে চড়ে বসেন শাকিল আহমেদ। বেল টিপে পিওনকে ডেকে দু'কাপ চা ও সিঙাড়ার অর্ডার দেন। জুলেখা মধুর হেসে বলেন,

–শুধু শুধু চা আনাচ্ছেন। এইতো একটু আগে নাস্তা করে বেরিয়েছি। এখনও একঘন্টা হয়নি..।

– বাসার চা? ও তো এতক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে, আমার সাথে খান এক কাপ। তা ভাল কথা ছেলের কি খবর, ভর্তি করতে পেরেছেন?

জুলেখা উঠার ভঙ্গি করে বলে,

www.pathagar.com

– ওই যাঃ! এতক্ষণ ধরে আপনাকে আসল কথাটি বলা হয়নি। তার আগে আমার এবং আমার স্বামীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন শাকিল ভাই। আপনি ফোনে প্রিন্সিপালকে বলে না দিলে কিছুতেই ছেলেকে ভর্তি করাতে পারতাম না।...

শাকিল সাহেব হেসে বলেন,

–এতো সামান্য একটি কাজ। আপনার জন্য এর চাইতে কঠিন কিছু করতে পারলে খুশী হতাম।

জুলেখা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বলে,

–ওহ্ আপনার তুলনা হয়না শাকিল ভাই। ছেলে ভর্তি করানোর চেয়ে কঠিন কাজ এই ঢাকা শহরে দুটি খুঁজে পাবেন না। কিন্ডার গার্টেনে ভর্তির জন্য দশ বিশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিলেন। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

শাকিল সাহেব সুযোগ পেয়ে বলে উঠেন "কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়োজন নেই। এক সন্তানই যথেষ্ট শ্লোগানটি মনে রাখলেই হবে। No more one.

–জুলেখার ফর্সা গাল লাল হয়ে ওঠে। দুচোখে ছদ্মকোপের দৃষ্টি হেনে বলে,

–আরও? আর নয় বাবা একটাই যথেষ্ট।

শাকিল সাহেব স্বস্তির শ্বাস ফেলেন, জুলেখা তোমার যৌবন দীর্ঘায়ু হোক। তোমার অপরূপ সুন্দর দেহলতা অটুট থাকুক। তোমার চোখের অপরূপ দৃষ্টির সরোবরে শাকিল আহমেদের তৃষিত হৃদয় অবগাহন করুক বার বার যতদিন দেখা হবে দু'জনার! শাকিল সাহেব জুলেখার ভ্রুভঙ্গি উপভোগ করেন নিঃশব্দে।

তারপর বলেন–আজ লাঞ্চ আওয়ারের আগে একবার মিনিষ্ট্রিতে যেতে হবে। আপনিও চলুন না–কাজ সেরে বাইরে লাঞ্চটা সেরে নেবো না হয়! জুলেখা একটু চিন্তা করে বলে–আজ থাক শাকিল ভাই। লাঞ্চ আওয়ারে আমি একটু মার্কেটে যাবো। কিছু কেনা–কাটা আছে আজ না কিনলেই নয়।

–ওহ্ ঠিক আছে। আমি একাই যাবো। নিন চা নিন।

শাকিল আহমেদ ঈষৎ মনঃক্ষুন্ন হয়ে চায়ে চুমুক দেন।

www.pathagar.com

শাকিল সাহেব মিনিষ্ট্রিতে এসে দেখেন সেক্রেটারী মিটিংয়ে ব্যস্ত। তার পি.এ. বললেন–আজ আর আপনার সাথে দেখা হবে না। হঠাৎ জরুরী মিটিং এ স্যার আটকে গেলেন।

শাকিল সাহেব ফাইলটা পি.এ.কে দিয়ে বললেন–ঠিক আছে, এটা রাখুন। আগামী কাল ট্রাই করা যাবে। আজ চলি।

লাঞ্চ আওয়ারের এখনও আধঘন্টা বাকী। অফিসেই ফিরে চললেন তিনি। সামান্য দূরেই তার অফিস। এই দূরত্বটুকু হেঁটে সহজে পার করা যায়। শাকিল হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন জুলেখার সঙ্গে তিনিও না হয় মার্কেটে যাবেন। তারপরে কোন এক জায়গায় বসে ঠান্ডা কিছু না হয় খাওয়া যাবে।

কদিন ধরে দাঁতে ব্যথা হচ্ছে। ঠান্ডা খাওয়া কি ঠিক হবে? জুলেখা বড্ড আইসক্রীম, লাসসি, কোক, ফালুদা পছন্দ করে। ওকে সঙ্গ দিতে তাকেও বাধ্য হয়ে খেতে হয়। পরে ভূগতে হয়েছে। বাসায় স্ত্রীকে বারে বারে লবণ পানি গরম করে দিতে হয়েছে কুল্লি করার জন্য। সাথে স্ত্রীর মৃদু বকুনি– বয়স হয়েছে। মাঝে মাঝে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। তোমাকে কতবার বলেছি, কেন যাওনা? এদিকে আবার গলায় ঠান্ডা বাঁধিয়েছ। একটু বুঝে সমঝে চললে কি হয়? আয়েশা স্বপ্নেও কি ভাবতে পারবে কোন মেয়ে কলিগের সাথে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে আইসক্রীম খেয়ে গলা বসিয়েছেন? দাঁতে ব্যথা তুলেছেন?

সামান্য অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। তিনি অন্যায় অশোভন কিছু করছেন না। এই সামান্য সঙ্গটুকু ছাড়া এর বেশী তিনিও আশা করেন না। যে কোন বন্ধুর সাথে এরকম চলাফেরা দোষনীয় নয়। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, সাথে মেয়েরাও। আজকাল ছেলে বন্ধু মেয়ে বন্ধুতে তেমন তফাত কেউ করে না। জুলেখা তার বন্ধু, তার কলিগ। এর বেশী কিছু ত নয়। এ ধরনের মেলামেশা হর-হামেশা হচ্ছে। আজকাল কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় কি? কই তাঁর অফিসে ত কেউ কিছু কোন দিন বলেছে বলে তিনি শোনেননি? আসলে বাড়াবাড়ি তো তারা করেন না মোটেও। অফিসের কাজে দুজনা বের হন। রুমের ভিতর বসলেও অফিসের কাজকর্ম নিয়েই বেশী কথা হয়। নাহ বলার মতো –উল্লেখ করার মতো কিছুই ঘটেনি তাঁদের মধ্যে।

www.pathagar.com

জুলেখা শাকিল সাহেবের মনোবনে দখিনা হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। জুলেখার সৌন্দর্য্য সারল্য মাখা। তার প্রতি জুলেখার সহমর্মিতা ও নির্ভরতা হৃদয়গ্রাহী। শাকিল সাহেবের অন্তরের বদ্ধ ঘরের জানালা খুলে দিয়েছে জুলেখা তার সুমিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে। এই অনুভবটুকু তিনি নিজের মধ্যে লালন করছেন। কাউকে জানাবেন না এমনকি জুলেখাকেও নয়। হাঁটতে হাঁটতে অফিসে পৌঁছলেন। তৃতীয় তলায় তার রুমে যাওয়ার আগে আনমনে জুলেখার রুমের পাশে এসে দাঁড়ান। তার ধারণা ছিল এতক্ষণে হয়ত জুলেখা বেরিয়ে গেছে রুম তালাবদ্ধ করে কিন্তু তার পরিবর্তে পর্দাঘেরা খোলা দরজার উপর হতে জুলেখার মিষ্টি উচ্চকিত হাসি তার দু'পাকে স্তব্ধ করে দিল। তিনি রুমে ঢুকতে গিয়েও ঢুকলেন না। কারণ আর একটা পুরুষ কণ্ঠের গাঢ় গম্ভীর গলা শুনতে পেলেন।

–জুলেখা আপনার মত এমন স্মার্ট আধুনিকা একজন তরুণী কি করে ওই বুরবক ওল্ড হর্সটার সাথে জড়িয়ে পড়লেন। আমরা অফিসের সবাই ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছি না।

জুলেখা হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে।

– জড়িয়ে পড়েছি কে বলল। ভান করছি, স্রেফ ভান করছি। জানেন তো ফায়দা লুঠতে হলে যেমন দেবতার তেমন পুজো দিতে হয়। একটু তোষামোদ একটু হাসি দিয়ে ওই বুড়োকে কাত করে ফেলেছি। শাকিল সাহেব বজ্রাহত ব্যক্তির মত নিরলম্ব দাড়িয়ে রইলেন। তার শ্রুতি যেন বধির হয়ে গেল, তার দুচোখ যেন দৃষ্টিহীন! পুরুষ কণ্ঠ আবার বলে ওঠে।

–নিজের উন্নতি করতে না জানলেও অন্যের উন্নতিতে তিনি মই এর কাজ করেন। এটা অবশ্য অনেকেই স্বীকার করেন। ভদ্রলোক প্রশংসা তোষামোদের কাঙাল। পটিয়ে–পাটিয়ে কত জনেই কতভাবেই না উপকৃত হচ্ছে। বলতে গেলে পুরো অফিস তার কাছে ঋণী।

জুলেখার কণ্ঠ শোনা যায়, "তবু বেচারার প্রমোশন হয় না। আরে অত সত্যনিষ্ঠ হলে কি চলে। এ দুনিয়া চলছে কিসের জোরে তা–কি তিনি দেখেন না। ওই এক গোঁ নিয়ে আছেন...না তিনি আদর্শ বিসর্জন দিতে পারবেন না।" জুলেখার মিহি গলায় আবার শোনা যায়,

www.pathagar.com

–জানেন তো দু'একদিন তার সাথে ঘোরাঘুরি করে ছেলেকে শহরের নামী কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করিয়েছি। প্রিন্সিপাল ওঁর ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন বলে ওর কথায় ডোনেশন দেওয়ার থেকে রেহাই পেয়েছি।

পুরুষ কণ্ঠকে শাকিল সাহেবের চিনতে অসুবিধা হয়না। তারই জুনিয়র সহকর্মী ইলিয়াস। ইলিয়াস বলে–কৃতজ্ঞতা জানাতে বুঝি আজ তার সাথে এপয়েন্টমেন্ট রেখেছেন। আমার অনুরোধে লাঞ্চে যাচ্ছেন না? জুলেখা বলে আরে না–আজ আমার স্বামী দেবতাটি হঠাৎ কি মর্জি হলো আমাকে শাড়ী কিনে দেবে। কদিন পরেই আমাদের ম্যারেজ ডে কিনা। জানেন না তো কত ধরনের প্রোব্লেম। ঘরে বাইরে সব ট্যাকল করতে হয় অনেক মাথা খাঁটিয়ে।

ইলিয়াসের সপ্রশংস গলা ভেসে আসে,

–আপনি শুধু সুন্দরীই নন, দারুণ বুদ্ধিমতীও। ঠিক আছে নেক্সট শনিবারটা এই অধমের জন্য রাখলে ধন্য মনে করবো নিজেকে।

–কথা দিতে পারছিনা তবে চেষ্টা করবো। জুলেখার মৃদু গলা ভেসে আসে।

শাকিল সাহেবের মনে হলো যথেষ্ট হয়েছে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা অশোভন। এই অবস্থায় পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢোকার কোন মানেই হয় না।

তিনি শ্লথ পায়ে, ক্লান্ত পরাজিত সৈনিকের মত নিজের রুমে এসে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়েন। কপালের দুপাশের রগ দপ দপ করছে। উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা মনে হয় লাফাচ্ছে। হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ বোধ করেন। বুকে এক ধরনের চাপ চাপ ব্যাথা সেই সাথে চোখে অন্ধকার নেমে আসছে। ভয় পেয়ে চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে থাকেন। এক সময় বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে আসে। একটু আগে শোনা কথাগুলো আবার তার কানে বেজে ওঠে। তিনি জোর করে সেই মূহূর্তটাকে ভুলতে চাইলেন।

ছিঃ! ছিঃ! কি লজ্জা! তাকে গ্রাস করতে চাইছে। যাকে এক টুকরো দখিনা বাতাস ভেবেছিলাম সে আজ নাগিনীর বিষ নিঃশ্বাস হয়ে তার শ্বাস রুদ্ধ করতে চাইছে। একি ভুল করলেন তিনি। এভাবে কেন নিজেকে প্রতারিত হতে দিলেন? তাঁর বয়স অভিজ্ঞতা দিয়ে সামান্য একটি মেয়ের অভিনয় ধরতে পারলেন না। নিজের প্রতি অশ্রদ্ধায় তার বিবমিষা জাগে। তিনি তার সেই আসন নিজেই ভেঙ্গে ফেলেছেন যা তাঁকে অন্যদের উপর বসিয়ে ছিল। স্বার্থের জন্য কেউ টাকা ঘুষ দেয়, কেউ দেয় সঙ্গ–ভালবাসা... সহমর্মিতা..???. শাকিল সাহেব লজ্জায় শরমে মরে যেতে চাইলেন। ছিঃ! জুলেখা তাকে বলছে বেচারা! অফিস শুদ্ধ লোক তার দিকে আঙ্গুল তুলে

www.pathagar.com

বলছে শাকিল সাহেব নিজেকে বিক্রি করেছেন খুবই নগন্য দামে। হা-হা বুড়ো বয়সে এক মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে যুবক সাজতে চাইছিলেন। ছিঃ! ছিঃ! সর্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

ক'দিন আগে বিশ্বকাপ ফুটবলে তাঁর দল হেরেছিলো বলে অনেকে তাকে সান্ত না দিয়েছিলো। আগামী বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখিয়েছিলো। আজ তিনি নিজের কাছে নিজেই হারলেন। কেউ তাঁকে সমবেদনা জানানোর জন্য এগিয়ে আসবেনা। এ ভালই হলো খেলা জমে উঠার আগেই ভেঙ্গে গেল। তা না হলে হয়ত আরও বেশী দুর্ভোগ ও লজ্জা তার ভাগ্যে জুটত। তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

অসময়ে শাকিল সাহেবকে বাড়ী ফিরতে দেখে স্ত্রী আয়েশা বেগম দ্রুত কাছে এসে দাঁড়ান।

–তোমার কি হয়েছে? শরীর খারাপ? এত তাড়াতাড়ী বাড়ী ফিরলে যে?

–শাকিল সাহেব ধীরে সুস্থে বিছানায় বসেন। আয়েশা বেগম ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর দিকে উদ্বেগাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন।

শাকিল সাহেব স্ত্রীর চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসেন। এলোমেলো চুলে ঘেরা আয়েশা বেগমের ঘামে ভেজা মুখ, মলিন শাড়ি এখনো গোছল সারা হয়নি। বয়সের ছাপ পড়া মুখে গভীর ক্লান্তির সাথে উদ্বেগ মিশে আছে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর মমতা অনুভব করেন। কতদিন..কতদিন স্ত্রীর মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন নি। তার চাইতে দশ বছরের ছোট অথচ কত বেশী শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। তবু শীর্ণ মুখের কোথায় যেন বেলাশেষের অপসৃয়মান আলোর মত একটুকরো লাবণ্য যাই-যাই করে এখনও টিকে আছে। তিনি স্ত্রীর পিঠে হাত রাখেন।

–ব্যস্ত হয়োনা আমি ঠিক আছি। সারাজীবনই ত টাইম মেনে অফিস করলাম। কতজন কতভাবে অফিস ফাঁকি দেয়। কোন দিন ত নিজে দিইনি। বিনিময়ে কি পেলাম বল! নিয়মানুবর্তিতা সততার বিনিময়ে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক নিতে বাধ্য হচ্ছি। তা ভাবলাম একটু ফাঁকি না হয় দিয়েই দেখি আজ।

আয়েশা বেগমের মুখের উপর হতে চিন্তার ছায়া সরে যায়। লজ্জার হাসি হেসে বলেন,

–আমার এখনও রান্না সারা হয়নি। যাই রান্নাটা সেরে ফেলিগে।

–অত তাড়ার কি আছে? বসোই না একটু।

www.pathagar.com

–আয়েশা বেগম স্বামীর চোখে অন্য রকম দৃষ্টি দেখে ভিতরে ভিতরে একটু অবাক ও লজ্জিত হন। কি নোংরা দেখাচ্ছে তাঁকে কে জানে। সংসারের অধিকাংশ কাজই ত নিজের হাতে করতে হয়। নিজের দিকে মনোযোগ দেয়াটা তেমন হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে যার জন্য সাজগোজ তিনি ত কখনো চোখ তুলেই তাকান না। আজ কি হলো? বারে বারে ভিন্ন এক দৃষ্টিতে স্বামী তাঁকে দেখছে। কি হয়েছে, শাকিল সাহবের?

– আয়েশা, সারাদিন তোমাকে খুব খাটতে হয়, না? তুমি মোটেও নিজের দিকে খেয়াল করো না। এখন থেকে একটু কম কম খাটবে। আমি ছেলে–মেয়েদের বলে দেবো ওরা যেন তোমাকে সাহায্য করে?

আয়েশা বেগম স্বামীর মুখে অপ্রত্যাশিত সমবেদনা শুনে হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। শাকিল সাহেব আয়েশা বেগমের মনের কথা বুঝতে পারেন।

–আমার কথা শুনে খুব অবাক হচ্ছ তাইনা? আসলে কি জানো আজ হঠাৎ করে মনে হলো আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তোমারও বয়স বেড়েছে। এই বয়সে তুমি ছাড়া আমার কাছের মানুষ আর কে আছে বলো? আমাদের দু'জনেরই একটু যত্ন আত্তি দরকার, তুমি করবে আমাকে, আমি তোমাকে কি বল?

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তন

ক্লাশ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বেরুতে চাইলেও বেরুতে পারেনা অরনী। ক্লাশমেটরা ওকে ঘিরে ধরে।

–কংগ্রাচুলেশন্স! আমাদের সকলের তরফ হতে কংগ্রাচুলেশনস অরনী। তোমার অপূর্ব পারফর্মেন্সের জন্য।

সজল এগিয়ে এসে অরনীর হাত ঝাঁকিয়ে দেয়। অরনী হাসে।

–বাড়িয়ে বলছো ত?

–সত্যি অরনী তুই যে এত ভাল আবৃত্তি করতে পারিস জানতাম না। দেবযানীর ভূমিকায় তোকে অপূর্ব লাগছিল। লেখাপড়াতে যেমন এগিয়ে, সাংস্কৃতিক ব্যাপারেও তোর জুড়ি নেই। সুমি বলে।

–থাক আর গ্যাস দিস না ফেটে যাব কিন্তু।

সজল চোখ টিপে বলে, 'অরনী তোমার রোমিও কি গেটের কাছে প্রতীক্ষামান? যদি না হয়ে থাকে চলো–সবাই মিলে ক্যান্টিনে যাই।

–ওঃ এই ব্যাপার! এত গ্যাস দিচ্ছিলে আমার ব্যাগ খালি করার জন্য?

–আরে না–না সবাই সমস্বরে বলে।

–আজ কিন্তু আমার ব্যাগ একেবারে শূন্য। আরেকদিন খাওয়ার কথা দিচ্ছি। আজ যেতে দে।

ওদের সরিয়ে অরনী বের হয়ে আসে। গেটের কাছে যথারীতি অলয়ের ক্ষুব্ধ উপস্থিতি।

–এতো দেরী করলে, পাক্কা সাঁইত্রিশ মিনিট উনষাট সেকেন্ড ধরে তোমার অপেক্ষা করছি। এ রকম করলে আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

–তুমি না এলেই পারো। আমি তো তোমাকে বারণ করেছি রোজ রোজ আসতে। অলয় কড়া চোখে তাকায়।

তোমার মতো মেয়ের মুখেই এসব মানায়, স্বামী হলে বুঝতে কি যন্ত্রণা!

অরনীর মুখ ভার হয়ে যায়। প্রতিদিন অলয় ওকে নিতেও আসবে ঝগড়াও করবে। অরনীর ভাল লাগেনা।

www.pathagar.com

–আমার মতো মেয়ে মানে কি বুঝাতে চাচ্ছ?

হোন্ডায় ষ্টার্ট দিতে দিতে অলয় বলে,

–তোমার মতো উইমেন লিভ এর ধ্বজাধারী রমনী আর কি! যাদের কাছে স্বামীর চেয়ে বন্ধুদের ভাল লাগে, বাসার চাইতে কলেজ ভালো লাগে, বিবাহিতা হয়েও কুমারী কুমারী ভাব দেখায়।

–অসহ্য!

অরনীর চোখ ফেটে পানি আসে। অলয়টা দিন দিন এমন হিংসুটে হয়ে যাচ্ছে কি করে ভেবে পায়না। রমণী শব্দটাও আপত্তিকর ঠেকছে। বিশ বছর বয়সে সেকি রমণী হয়ে গেছে।

–কি হলো ওঠো!

অলয়ের পিছনে বসতে বসতে অরনীর মনে হলো অলয় একটি বাজে ছেলে–খুব বাজে। খুব কাছে বসে থাকা অরনীর উপস্থিতি আস্তে আস্তে অলয়ের মনটা ঠান্ডা করে দেয়। সে অকারণে অনেক দূর ঘুরে গিয়ে বাসার পথ ধরে। প্রচন্ড গতিকে অরনী খুব ভয় পায়। আজ সে চুপ করে আছে। বাসার কাছে পৌছে অলয় ফিরে তাকায়। দেখে অরনীর ভেজা চোখ। সে একইসাথে বিস্মিত এবং অনুতপ্ত হয়।

–অরু ডোন্ট মাইন্ড প্লীজ! আজ তাড়াতাড়ী ফিরব। অরনী ঝট্‌কা মেরে হাত সরিয়ে নেয়। তীব্র কণ্ঠে বলে,

–তুমি একটি বাজে লোক, খুব বাজে লোক।

কান্না চাপতে চাপতে সে ছুটে গেটে ঢুকে পড়ে। অলয়ের আবার রাগ চাপে। সে বাজে লোক, অরনী পারল এটা বলতে! প্রচন্ড স্পীড তুলে সে বেরিয়ে যায়। আজ দুপুরে ফিরবে ত না রাত্রেও ফিরে কিনা সন্দেহ!

বাসায় ফিরে অরনী পরে দরোজা দিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছে। চার বছরের বিবাহিত জীবনকে খুব তুচ্ছ মনে হচ্ছে। অলয় এত রাগী আর রাগলে এমন যা–তা বলে, ভাবতেই বিতৃষ্ণা জাগছে ওর মনে।

প্রায়ই সে ওর ক্লাশ মেটদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে। অলয়ের ধারণা ছেলেরা অরনীর প্রেমে পড়ার জন্য হ্যাঁ হয়ে বসে আছে। প্রথম প্রথম এ সব শুনলে গর্বমিশ্রিত একধরনের আনন্দ অনুভব করতো। এখন শুনতে শুনতে

www.pathagar.com

অসহ্য লাগে। অলয় কি করে এতো নেমে যাচ্ছে? অলয়দের বাড়ীতে কেউ ওকে তেমন একটা ভালবাসেনা। অবশ্য এটা ওর অনুমান। কার্যত তেমন কিছু চোখে পড়েনা। খুব স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে অলয়। অরনীর পরিবারও তাই। অর্থের চিন্তা ওদের নেই তবু দুটি মানুষ পাশাপাশি মনের শান্তি নিয়ে বাস করতে পারে না কেন? আসলে অলয় চায়না ও লেখাপড়া করুক। এটাই ঠিক। অরনীর আবার কান্না আসে। কিন্তু ওযে আব্বুকে কথা দিয়েছে সে যেভাবেই হোক লেখাপড়া শেষ করবে। আর দুটো বছর যে ভাবেই হোক চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কি ভাবে? এভাবে প্রতিদিন অশান্তি করে করে?

– বৌমা খেতে এসো।

শ্বাশুড়ীর ডাকে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে দরজা খোলে–আমি পরে খাবো মা।

–আর কত পরে খাবে? তিনটে ত বেজে গেছে, অলয় ফিরলোনা কেন? আবার কি ঝগড়া হয়েছে,

– না মা!

– মিথ্যে বলোনা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখে পানি। শোন বৌমা প্রেম করা যত সহজ বিয়ে টেকানো তত সহজ নয়। নিজের ইচ্ছায় এ ঘরে এসেছো আবার যদি ভেবে থাকো নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে যাবে তা হবে না। তোমাদের মান সম্মানের ভয় না থাকতে পারে আমাদের আছে। একটু বুঝে–সুঝে চলো। যাও, এখন গিয়ে টেবিলে বসো।

শ্বাশুড়ীর অবাধ্য হবার সাহস ওর নেই। অরনী একা ভাতের টেবিলে গিয়ে বসে। ভাতের গ্রাস কিছুতেই গলা গিয়ে নামতে চায়না। কোনমতে এক গ্লাস পানি খেয়ে বেসিনে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে।

রাত হয়ে এসেছে। তবু অলয় ফিরলোনা অলয় মাঝে মাঝে রাগ করে দুপুরে খেতে আসেনা। এই খেতে না আসা ওর প্রচন্ড রাগের বহিঃপ্রকাশ। ভাল খাওয়া দাওয়ার প্রতি অলয় খুব দুর্বল। অলয়ের জন্যই শ্বশুড়ীকে রান্নাঘরে যেতে হয়। একেক দিন একক পদের খাবার তার প্রিয়। সবাইকে নিয়ে টেবিলে বসে অরনীর সাথে–খুনসটি করে মাকে খেপিয়ে ভাত না খেলে অলয়ের পেট ভরে না। দুপুরে দুটো–তিনটের ভিতর রাতে আটটা–নটার ভিতর এবাড়ির খাওয়ার পাট চুকে যায়। আজ দুপুরে অলয় আসেনি। রাতেও

www.pathagar.com

যখন এলোনা, শ্বাশুড়ীর ঘরে আর একবার তলব হলো অরনীর। মামলার আসামীর মতো অরনী হাজির হয়েছে। অলয়ের সাথে গত রাত থেকে আজ দুপুর পর্যন্ত কি কি কথা হয়েছে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে হয়েছে।

রাত দশটার পর হতে টেলিফোনে ঝড় উঠে গেল। চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল। অলয় প্রতিদিন যেখানে যেখানে যায় খবর নেয়া হলো। অলয় যেখানে বসে মিলের অফিসে খবর নেওয়া হলো। ওরা জানাল অলয় দুপুর বারটার সময় বের হয়ে আর সেখানে ফিরে নি। তাহলে কোথায় গেল? শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে। চিটাগাং এ বড় ছেলের বাসায় খবর নেওয়া হয়। না সেখানে যায়নি। পরদিন বোনদের বাসায় খবর নেওয়া হলো। সকল আত্মীয় স্বজনের বাসায়ও। কোথাও অলয় নেই। সকল বন্ধু-বান্ধব কেউ অলয়ের কোন খোঁজ দিতে পারলোনা। আশ্চর্য অলয় কি হাওয়া হয়ে গেল? একটি লাল রঙের হোন্ডা পঁচিশ বছরের একটি জ্বলজ্যান্ত তরুণ যার পরনে ছিল জিন্স ও আকাশী রঙের শার্ট। হোন্ডাসহ কোথায় মিলিয়ে গেল। ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে রাজপথে হোটেলে পার্কে অজস্র পরিচিত মুখের মেলা। তাদের সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অলয় কি করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো? নিরুদ্দেশ? সকল স্টেশন, এয়ার পোর্টে অলয়ের বর্ণনাসহ খবর গেলো, না নেই। কোথাও অলয়কে দেখা যায়নি। বাকী থাকে হাসপাতাল। আহত কিংবা মৃত । বেডে কিংবা মর্গে। তাতেও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। হতাশার চরম শিখরে পৌছে অলয়ের বাবা-মা এখন শোকে মুহ্যমান। দুপুর হতে আত্মীয়-স্বজনের ভীড় বাড়ছিলো বাসায়। অরনীর বাবা-মাও এসেছেন।

অরনী স্তব্ধ হয়ে নিজের ঘরে বসেছিল। অরনী হৃদয়ের গভীরে বুঝেছে অলয় ওকে শাস্তি দিচ্ছে কিন্তু কিসের জন্য? কেন? আত্মীয়-স্বজন সকলের চোখে নীরব জিজ্ঞাসা বৌয়ের সাথে ঝগড়া করে ছেলে বেরিয়ে গেছে!! জ্বলজ্যান্ত ছেলেটা বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে কেউ বলতে পারেনা আজকাল চারিদিকে গুমহত্যা হচ্ছে। কে কোন উদ্দেশ্যে কোন অপরাধে নিরীহ পথচারীকে মৃত্যুদন্ড দিচ্ছে তা ত কেউ বলতে পারেনা। এমনকি মৃত্যু পথযাত্রীও বলতে পারেনা তাকে কে মারছে, কেন মারছে। কে বলতে পারে

www.pathagar.com

অলয় তাদের শিকার হয়েছে কিনা? অমন শক্ত জেদী মাও এক সময় কান্নার অতলে ডুবে যান। বাবার প্রেশার বেড়েছে। ডাক্তার আসছে যাচ্ছে।

অরনী কি পাথর হয়ে গেল? ওর চোখে পানি নেই। আটচল্লিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে কোন খোঁজ নেই। অরনী দম দেওয়া পুতুলের মতো যে যা বলে শোনে সারা রাত অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকে। চুপি চুপি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। আর কতো অপমানিত করবে? তুমি কি বেঁচে আছো? তবে কেন আসনা? এভাবে তুমি চলে যেতে পারনা..না না.. এভাবে নয় ... কিছুতেই না?

সাত দিন পার হয়ে গেলো কোন খবর নেই। লোকজন আস্তে আস্তে নিজেদেরকে সরিয়ে নিলো। বিরাট বাড়িটিতে ওরা তিনজন। অন্তরে-বাহিরে শুধুই ফাঁকা। অসীম শূন্যতা তিনজন মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়। অরনীকে ওর মা বাবা নিয়ে যেতে এসেছিল, অরনী যায়নি।

অরনীর বিছানা হতে উঠার শক্তি নেই। লজ্জায় ও এমনিতে বেরুতে পারতনা। এখন শারীরিক ভাবেই সে ভেঙ্গে পড়েছে। অলয় যে ওর এতখানি জুড়ে ছিল সে আগে বোঝেনি। অলয়হীন জীবন সে কি করে কাটাবে? অরনীর ঘুম হয়না একেবারেই। আজ যদি একটু ঘুম আসতো... সে কোনমতে দেহটা তুলে উঠে ড্রয়ার খুলতে যায়। জানালা দিয়ে একপলক বাইরে তাকায়। গেটের কাছে অনেক মানুষের চেচামেচি জটলা। সিঁড়িতে দুপদাপ আওয়াজ। অরনী দুটো পিল মুখে দেয়। অমনি পাশের ঘর হতে কান্না ও অজস্র কোলাহল ভেসে আসে। অরনী ভয় পেয়ে যায়। তবে কি...? না ..না... ও দৃশ্য সে সইতে পারবে না। তাড়াতাড়ি সবগুলো ঘুমের ঔষধ মুখে ঢেলে দেয়।

বিছানায় শুতে শুতে একবার মনে হলো অলয়ের আওয়াজ সে শুনেছে, পরক্ষণেই মনে হয় ওর মনের গভীর থেকে অলয় কথা বলছে, আসলে অলয় হারিয়ে গেছে চিরদিনের মতো....

–অরনী..অরু আমি ফিরে এসেছি... দ্যাখো..সত্যি সত্যি আমি ফিরে এসেছি।

–অরনী মধুর হাসে তোমাকে আসতে হবেনা আমিই তো তোমার কাছে যাচ্ছি অলয়।

www.pathagar.com

তীব্র অনুশোচনায় জ্বলতে জ্বলতে অলয় অরনীর তন্দ্রাচ্ছন্ন শিথিল দেহটা বুকে তুলে নেয়। আর তখনি অরনীর হাতের মুঠোয় হতে শিশিটা গড়িয়ে পড়ে। অলয় চিৎকার করে ডাকে,

মা-মা শীগগীর গাড়ী বের করতে বল। অলয় পাগলের মতো অরনীকে ঝাঁকাতে থাকে।

-অরু কথা বল শোন দ্যাখো..চেয়ে দেখো। চোখ খোল...আমি এসেছি, অরু.. অরু.. ।

অরনীর ঘরে তখন তুমুল হৈ চৈ। ডঃ চৌধুরী ছুটে এলেন। অরনীকে পরীক্ষা করে অভয় দিলেন।

-চিন্তা করোনা, হাসপাতালে নিয়ে স্টমাক ওয়াশ করলে ঠিক হয়ে যাবে। তবে বড় দুর্বল হয়ে গেছে।

অলয়ের মা অরনীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে- ওরে হতভাগী আজকে এই খুশীর দিনে তুই একি কান্ড করলি।

অলয়ের বাবা তীব্র ভৎর্সনার চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন-ছেলে মানুষীরও একটা সীমা থাকা উচিত। এরকম নির্মম জোক একমাত্র পাষন্ডরাই করতে পারে। বোকার মতো চোখের জল না ফেলে তাড়াতাড়ি বৌমাকে নিয়ে গাড়ীতে ওঠো...কুইক!

তিন ঘন্টার অবিরাম চেষ্টায় অরনীকে ডাক্তার শঙ্কামুক্ত বলে ঘোষণা করলেন। সবার মুখ হতে দুশ্চিন্তার কালোছায়া সরে গিয়ে স্বস্তি ফুটে ওঠে। আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীরা যখন একে একে সবাই চলে গেল, অরনী ও অলয়কে রেখে। অলয় তখন ভীষণ ফাঁফরে পড়ে যায়। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে আবৃত অরনীর ক্ষীণ দেহ যেন বেডের সাথে মিলে আছে। পান্ডুর মুখ ফ্যাকাশে ঠোঁট। দুচোখ বোজা এলোমেলো চুলের রাশ বালিশে ছড়িয়ে আছে। খুব ধীরে ধীরে ওর বুক ওঠানামা করছে।

অলয় অরনীকে নিজের নিরুদ্দেশের কথা কিভাবে পাড়বে!

প্রথমে তীব্র অভিমান ও পরে অপার কৌতুহলে সে রাজী হয়েছিল রকিবের প্রস্তাবে। হঠাৎ পথে রকিবের সাথে দেখা। রকিব ওর স্কুল জীবনের বন্ধু । পাশ করে চাকুরী নেওয়ার পর কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার কোন হিসাব কেউ রাখেনি। রকিব সিলেটের চা বাগানের ম্যানেজার হয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। অলয়কে পেয়ে সেদিন সে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় তার সাথে সিলেট যাওয়ার জন্য। সেদিনই যাত্রা। অলয় সামান্য দ্বিধা করে ওর সাথে

www.pathagar.com

যেতে রাজী হয়। তার অনেকদিনের শখ বন্য প্রকৃতি দেখার-শিকার করার। রকিবের পাঁজেরোতে নিজের হোন্ডাটা তুলে দিয়ে সে রকিবের পাশে বসে পড়ে। একটা এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় সে তখন বাড়ীর কথা ভুলে থাকতে চেয়েছে। সে এও জানত বাড়ীতে জানালে সেদিন তার যাওয়া হতনা।

সাতদিন থাকার কথা ভাবেনি। মাঝখানে হরতাল অবরোধ এসবের ঝামেলায় তার দেরী হয়েছে। কটা দিন দূরে সরে গিয়ে অরনীকে জব্দ করতে চেয়েছে কিন্তু অরনী যে এভাবে নিজের উপর শোধ নেবে সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। অনুশোচনায় তার ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

ছোট্ট কেবিনটিকে তার বিশাল হল ঘরের মত মনে হচ্ছে। সে যেন বিচারকের সামনে আসামীর কাঠগড়ায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। অরনী ওকে কি শাস্তি দেবে? যাই দিক সে মাথা পেতে নেবে। অরু তার প্রিয় সত্তা, তার জীবন। সে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে অরনীর নিদ্রিত মুখের দিকে। এত সুন্দর দেখাচ্ছে অরনীর ক্লান্ত মুখটিকে। অলয়ের দু'চোখ জলে ভরে যায়। সে একটি পাষন্ড! ক্ষমার অযোগ্য!

-এই শুনছো? জানলাটা একটু খুলে দেবে?

-অরনীর কণ্ঠ স্বরে অলয়ের বুকের ভিতর হাজার পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে উঠে যেন। ছুটে গিয়ে জানলাটা খুলে দিয়ে অরনীর বেডের পাশে বসে পড়ে। ওর দুটো হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে,

আমাকে ক্ষমা করো অরনী... আমার ভুল হয়ে গেছে।

-অরনী আস্তে বলে-তুমি আমাকে হারাতে চেয়েছিলে না? ভালবাসার পরীক্ষায় আমাকে তুমি হারাতে পারবেনা। কক্ষনো না, কক্ষনো না।

অলয় ব্যথিত কণ্ঠে বলে-এমন ছেলে মানুষী কান্ড কেন করলে, যদি মারাত্মক কিছু হয়ে যেতো? অলয়ের গলার স্বর আবেগে বুজে আসে।

-ছেলে মানুষী কে আগে করেছে? আমি না তুমি?

-আমাকে ক্ষমা করো অরু? প্লীজ। অলয় গভীর ব্যাকুলতায় অরনীর দুটি ক্লিষ্ট হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে।

-ক্ষমা!! অরনী তীব্র মর্মভেদী দৃষ্টিতে অলয়ের দিকে তাকায়। ভালবাসা, ক্ষোভ, হতাশা ও গ্লানির সংমিশ্রণে উদ্ভুদ সেই মর্মান্তিক দৃষ্টির সম্মুখে অলয় মাথা তুলতে পারে না।

www.pathagar.com

-আমাকে ক্ষমা করো। পুনরায় এই কথাটুকু সে কোনমতে বলতে পারল। অরনী অস্ফুটে বলে-

-ক্ষমা! এত সহজে? তুমি আমাকে এতো দুঃখ দিলে... এতো লজ্জা দিলে... এতো নিষ্ঠুর তুমি... তারপরও আমার কাছ হতে ক্ষমা চাইছ? তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছু অবশিষ্ট নেই-আমার প্রাণটুকু ছাড়া-সেই টুকু কেন নিলে না? কেন বাঁচালে আমায়?

অরনী পাশ ফিরে বালিশে মুখ গুঁজে হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

নিরুদ্ধ আবেগে অলয়ের গলার কাছটায় ব্যথা করতে থাকে। রোরুদ্যমান অরনীর সাথে কিভাবে সন্ধি করবে, কি করলে তার সম্পর্ক পূর্বের মতো স্বাভাবিক হবে-। অলয় বুঝতে পারছে না। অরনীকে সে কি দুর্দান্তভাবে ভালবাসে তা কি করে বুঝাবে। অরনীর কাছ হতে আরও গভীর ভালবাসা পাবার আকাঙ্খায় তার কাছ হতে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে দেড় সপ্তাহ দূরে থাকতে হয়েছে।

অরনীর উপর রাগ করে তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ নিতে গিয়ে লেখক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে গিয়েছিল দুজনে। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল আগামী ঈদ সংখ্যায় একটি জমাট মানবিক উপন্যাস উপহার দেয়। রাজধানীর কোলাহলে সহস্র ব্যস্ততার ভিতর লেখক তেমন সময় পাচ্ছিলেন না। তিনি মাঝে মাঝে উধাও হতেন লেখার উদ্দেশ্যে। তার একটি গোপন আস্তানা ছিল। সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ। কেউ জানতনা তার সেই প্রিয় জায়গাটির কথা । সেদিন দীর্ঘ সময় পর অলয়কে পেয়ে তার মনের কবাট খুলে গিয়েছিল। গোপন আস্তানাটির নাম শুনে লাফিয়ে উঠেছিল অলয়ও। তার ছাব্বিশ বছরের তারুণ্য উল্লাসিত হয়েছিল।

বহির্জগতের সাথে কোন যোগাযোগ রাখা যাবে না এই শর্তে পালিয়েছিল দু'জনে। শহর ছেড়ে সমুদ্র অভিমুখে। কক্সবাজার মোটেলের দুটো রাত বাদ দিয়ে দ্বীপের সেই দিনগুলি কি আদিম সৌন্দর্য্যময় ছিল। চারিদিকের বিশাল নীল জলরাশি! দিক দিগন্তহীন সেই নীল চাদরে মোড়া সমুদ্র কি অপরূপ সুন্দর! সাদা পাল তোলা জেলে নৌকা, বিশাল বোট নৌকা সবই লাগত দূরাগত কোন পাখির ছবির মত!

লেখক যখন ঘরে বসে লেখা চালিয়ে যেত অলয় তখন কখনো স্থানীয় লোকজনদের সাথে ভাব বিনিময়ের চেষ্টা চালাত। কখনো সমুদ্রতটে নোঙ্গর ফেলা বোটের পাটাতনে শুয়ে রাত্রির নৈঃশব্দকে বুকের ভিতরে অনুভব

www.pathagar.com

করতো। নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে অরনীর কথা ভাবতে ভাবতে প্রহরের পর প্রহর কেটে যেতো নিঃশব্দে। রাত্রি একটু ঘন হয়ে এলে বেলাভূমি পাড়ি দিয়ে কটেজে এসে ধোয়া উঠা গরম ভাত, তাজা লট্যা মাছের ঝোল মেখে খেতে কি অপূর্ব লাগত। সে সব কথা কি অরনী শুনতে চাইবে না? কত কথা মনের ক্যাসেটে বন্দী করে এনেছে অরনীকে শুনাবে বলে। অরনীকে কি সত্যই রেখে গিয়েছিল? তার সঙ্গে তার মনের হৃদ কৌঠায় ভরে কি অরনীকে নিয়ে যায়নি? না হলে নিঃসঙ্গ নীরব প্রহরগুলো অত বাঙ্ময় মনে হতো কেন তার কাছে!

অরনীর সাথে সংলাপে মেতে থেকে কত প্রহর কেটেছে। সে সব কি বলা হবে না? কি অবুঝ মেয়ে। অমনি ঘুমের পিল খেয়ে আত্নহত্যা করতে বসে গেল! অলয়কে মৃত ভেবে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাইল! আহ!!! এই ভালবাসার প্রতিদান সে কি দিয়ে দেবে? সে একটি অপদার্থ, পাষন্ড, ক্ষমার অযোগ্য।

অলয় বেদনায় দীর্ণ হতে হতে উঠে দাঁড়ায়!

অরনী শোন আমার দিকে তাকাও ক্ষমা করতে না পারো তবে শাস্তি দাও। তোমার দেওয়া যে কোন শাস্তি আমি মাথা পেতে নেবো দাও।

অলয় হাটু গেড়ে বসে মেঝের উপর। অরনীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়া থরথর কম্পিত বুকের কাছে অলয় তার অপরাধী মাথাটি রাখে। কান্নার প্রবল উচ্ছাসে ভেসে যেতে যেতে অরনীর দুটি ব্যাকুল হাত আশ্রয় খুজে পায় অলয়ের অনুতাপের অশ্রুতে ভেজা মুখমন্ডলের উষ্ণতায়!

www.pathagar.com

প্রতিদান

মধ্যরাতের অন্ধকার ভেদ করে বাংলাদেশ বিমান ছুটে চলেছে। জানালার বাইরে নিকষ অন্ধকার। ভিতরে নীল আলো নীলাভ দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছে।

যাত্রীরা অনেকে ঘুমে আচ্ছন্ন। দু-একজন জেগে আছেন হয়তো। তাদের মধ্যে মেহরুবা একজন। ঘুম আসছেনা চোখে, আবার কিছু পড়তেও মন চাচ্ছেনা। একটু আগে এয়ার হোস্টেস সুরেলা কণ্ঠে ঘোষণা করেছে, দশ হাজার ফুট উপর দিয়ে নাসিম ইকবালের পরিচালনায় বিমান উড়ে চলছে।

শেষ স্টপেজ ছিল আলো ঝলমল দুবাই এয়ারপোর্ট। এক ঘন্টার যাত্রা বিরতি। মেহরুবা নামেনি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছে আলো ঝলমল দুবাই এয়ারপোর্ট। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে লোকজনের আনাগোনা ও দূরের দুবাই শহরের আলোকমালা তাকিয়ে দেখেছে। দৃষ্টিকে ছাপিয়ে মন তার চলে গেছে সুদূর বাংলাদেশে-যেখানে তার দেশ, তার জন্মস্থান। পাঁচটি বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে তার মনপ্রাণ চঞ্চল হয়ে আছে-কখন বিমান ঢাকা এয়ারপোর্টে নামবে।

ডঃ মেহরুবা শহীদ! হাতে ধরা জার্নালের বিশেষ নিবন্ধের উপর তাঁর নাম ফুটে আছে। সোনালী অক্ষরে লেখা ডঃ মেহরুবা শহীদ। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের গবেষণা শেষ করে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরছেন। এক্টা শিহরণ খেলে যায় মেহরুবার সারা শরীরে। তার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। জীবনের ঐকান্তিক আকাঙ্খা, অনেক সাধনা ও অধ্যবসায়ের পর রূপলাভ করেছে। এই সাফল্যের পিছনে কত শ্রম, কত ত্যাগ, কত অশ্রু ঝরেছে তা কি কেউ জানবে কোনদিন? সবাই দেখবে মেহরুবা কত অনায়াসে সংসার, স্বামী ও একমাত্র সন্তানকে পিছনে ফেলে সুদূর আমেরিকায় গিয়ে ডিগ্রী ছিনিয়ে এনেছে। সত্যই কি সবকিছু খুব সহজে হয়েছে? মেহরুবাকে কি এর জন্য মূল্য দিতে হয়নি? কুঁড়ি কিভাবে ফুল হয়ে ফোটে সে ফুলই জানে, সন্তান কিভাবে জন্ম নেয় তার বেদনা শুধু মা-ই জানে।

www.pathagar.com

মেহরুবা পাঁচটি বৎসর স্বামীর সান্নিধ্য হতে, পুত্রের মা ডাক হতে বঞ্চিত থেকেছে। আহ্ কি দুঃসহ দীর্ঘ দিনরাত্রি তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে! সেই দুঃখময় দিনগুলি এখনও জলে ভাসা পদ্মের মতো বুকের গভীরে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। তখন সাহস যুগিয়েছে ওর রুমমেট লিসা। লিসার বন্ধুত্বের ঋণ মেহরুবা কোনদিন শোধ করতে পারবে না। আশ্চর্য সংগ্রামী মমতাময়ী মেয়ে লিসা।

অস্ট্রেলিয়ার মেয়ে লিসা এবং ওর থিসিসের প্রফেসর ডঃ জ্যাকবের সস্নেহ সাহায্য সহযোগিতা না পেলে মেহরুবার পক্ষে থিসিস শেষ করা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। মেহরুবাকে ওরা ঋণী করেই রাখলো।

–ডঃ মেহরুবা শহীদ আপনার একটি চিঠি আছে।

তরুণী এয়ার হোস্টেস মিষ্টি হেসে একটি নীল খাম এগিয়ে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিখানা হাতে নেয় মেহরুবা। প্রেরকের নাম দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। হৃদয়ের সহস্র কলগুঞ্জন নিমেষে থেমে গেল। লিসা নয়, ডঃ জ্যাকবও নয়, রায়ানের চিঠি! ও রওনা দেবার আগেই হয়ত ড্রপ করেছিল। মেহরুবার ঠোঁটে বিষন্ন হাসি ফুটে ওঠে।

এ পৃথিবীতে একসাথে সবাইকে বুঝি সুখী করা যায় না। আঘাত দেবোনা ভেবে চলতে গেলেও কারো না কারো গায়ে আঘাত এসে লাগে অজান্তে। দীর্ঘ প্রবাসে ছোঁয়াছুয়ি বাদ দিয়ে, হৈ হুল্লোড় এড়িয়ে চলা যে কি প্রাণান্তকর কষ্ট সে নিজে ভুক্তভোগী না হলে ভাবাই যায় না। একলা থাকা যে কি বিড়ম্বনা। মেহরুবাদের হোস্টেলে আরও দুজন ইন্ডিয়ান ও একজন পাকিস্তানী মেয়ে ছিল। ওরা ওর বিড়ম্বনা দেখে হাসতো। উপদেশ দিতো যস্মন। দেশে যদাচার, এভাবে থাকলে শুকিয়ে মরতে হবে। জানো না রোমে গেলে রোমান হতে হয়? মেহরুবা হেসে বলতো, আমি তোমাদের মতো কুমারী নই! আমার স্বামী সন্তান–সংসার আছে। ওরা খিলখিল করে হেসে বলতো,

আরে ভাই, তোমার মুখ দেখে তা বুঝা যায় না। মিস, না মিসেস? তাছাড়া এখানে মিস বা মিসেসের তেমন পার্থক্য নেই। তোমার যে চেহারা আর ফিগার, মিস বাংলাদেশ হয়ে পুরো ক্যাম্পাস যেভাবে মাতিয়ে তুলেছো। তার

www.pathagar.com

উপর ভাল ছাত্রী! ডঃ জ্যাকবের বিশেষ প্রিয় পাত্রী! আমাদের ত রীতিমত হিংসেই হয়।

–থাক হিংসের কাজ নেই, যত তাড়াতাড়ি পারি এদেশ ছাড়তে পারলে বাঁচি।

আচ্ছা বাবা তুমি যে এমন স্বামী–স্বামী করে পাগল হয়ে রইলে তুমি ফেরার আগে তোমার স্বামী যদি কিছু করে বসে তুমি কি করবে তখন?

মেহরুবা ওদের দুষ্টুমি মাখা কৌতূহলে হাসতো। বুকের কাছে অর্ন্তবাসের ভেতর স্বামীর চিঠির খসখসে কাগজের অনুভব নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়তো।

– অসম্ভব তা হতেই পারে না.. আমি যে ওর কতখানি সে তোমাদের বুঝানো যাবে না। কি হতে পারে আর পারে না তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনা। আমার একটাই কাজ তাড়াতাড়ি থিসিস শেষ করা!

প্রাণপণ খেটে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম সময়ে মেহরুবা থিসিস শেষ করতে চায়। তাই নিজেকে সে গুটিয়ে রেখেছে সব কিছু হতে। আমেরিকায় থেকেও আমেরিকান জীবনযাত্রা হতে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। জোর জবরদস্তি কেউ করে না কিন্তু রায়ান সরেও যায়নি। শুভাকাঙ্খির মতো, বন্ধুর মতো পাশে এসেছে। খোলাখুলি বলেছে– তোমাকে আমার ভাল লাগে, ইচ্ছে করলেও আমাকে তাড়াতে পারবে না। প্রেম না দাও, বন্ধুত্ব ত দিতে পারো। আমি তাতেই সন্তুষ্ট!

মেহরুবার বুকে সূক্ষ্ম ব্যথার পিন ফোটে। একটি সরল প্রাণ তরুণের অমন ভালবাসাকে সে গ্রহণ করতে পারেনি। সারা হৃদয় জুড়ে শহীদ। দূরে থেকেও প্রতি চিঠিতে শহীদের উপস্থিতি সে অনুভব করেছে।

পনের বৎসরের বিবাহিত জীবন । সুখে–দুঃখে কত ত্যাগ তিতিক্ষায় দুজনের জীবন একই সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। বধু জীবনের প্রথম দিনগুলিতে শহীদের সহানুভূতি, অকুণ্ঠ ভালবাসা না পেলে শুরুতেই শেষ হয়ে যেত তার বিবাহিত জীবন। ডঃ মেহরুবার বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এক জীবনে কত দুঃখের নদীই না তাকে পাড়ি দিতে হলো। সেই সব স্মৃতি তিক্ত ক্যাকটাসের মতো বুকের ভিতরটা কটুস্বাদে আচ্ছন্ন করে দিল।

www.pathagar.com

শিক্ষিত আধুনিক কোন পরিবারেও যৌতুকের শিকার হতে হয় কোন শিক্ষিতা তরুণীকে, বিয়ে না হলে টেরই পেতোনা। সে এক অবাঞ্ছিত অকথিত অধ্যায়। মেহরুবা এই যন্ত্রণা একাকী ভোগ করেছে। বাবাকে বুঝতে দেয়নি। ভাইবোনদেরও না।

মা ছিলেন না। অধ্যাপক পিতা তার স্বল্প পুঁজি দিয়ে বিয়ে দিয়েছেন, অন্যান্য বোনদের যেভাবে দিয়েছেন। তিনি ভাবতেই পারেননি ফ্রিজ, টেলিভিশন, ভিসিআরের অভাবে তার মেয়ের মুখের হাসি নিভে গেছে। এমন কোন দিন যেতনা শ্বাশুড়ী কোন না কোন ছুতো নিয়ে তার প্রতি বাক্যবাণ বর্ষিত করেননি। তার সরল সাধাসিধে অধ্যাপক পিতাকে চোর ঠকবাজ বিশেষণে ভূষিত করতো উপস্থিত অভ্যাগতদের সামনে। মেহরুবা অসীম ধৈর্য্য নিয়ে চুপ করে ছিল। কখনো ভেবেছে বাবার কাছে চলে আসবে চিরদিনের মতো। কিন্তু তা হয়নি। বাবা কষ্ট পাবে, তার মুখ ছোট হয়ে যাবে- মেহরুবা মেয়ে হয়ে কি করে বাবাকে ছোট করবে? তার পরিতৃপ্ত সুখী চেহারাতে কি করে দুঃখের কালি ঢেলে দেবে? আরও বন্ধন ছিলো শহীদের বন্ধন! প্রগাঢ় ভালবাসার বন্যায় মেহরুবাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আশ্বাস দিয়েছে একটু ধৈর্য্য ধরো লক্ষ্মীটি! ভাইবোনগুলো নিজের পায়ে দাঁড়ালে, তোমাকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতবো, একটু ধৈর্য্য ধরো।

মেহরুবা পাথর নয় সে একজন মানুষ। ওর বাপের বাড়ী হতে পাঠানো খাবার–দাবারগুলো যেদিন শ্বাশুড়ী পায়ে ঠেলে দিলেন, নিজেরা না খেয়ে চাকর–বাকরদের বিলিয়ে দিলেন সেদিন মেহরুবা অপমানে কঠোর হয়ে গেল। স্বামীর কাছে গিয়ে বলেছিলো,

–তোমাদের ইচ্ছে হলে আমাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করো সে আমি সইতে পারবো কিন্তু তোমাদের সংসারে থেকে বাবাকে গহনা–ভিসি আরের জন্য কিছুতেই বলতে পারবো না, কিছুতেই না।

শহীদ ওর কান্না ভেজা মুখ তুলে বলেছে,

www.pathagar.com

–ছিঃ ওভাবে বলো না। মায়ের অনেক আশা ছিল। আমাদের বাবা নেই, মা অনেক কষ্টে আমাদের মানুষ করেছেন। ভেবেছিলেন ছেলে বিয়ে দিয়ে ছেলে মানুষ করার কষ্ট সুদে আসলে তুলে নেবেন।

মেহরুবা বাধা দিয়ে বলেঃ মায়ের ছেলের কি ইচ্ছে ছিল?

শহীদ হেসে ফেললঃ তোমার মত মিষ্টি সুন্দরী একটি বৌ!

–যৌতুক পাও নাই সেজন্য দুঃখ হয়নি?

–তোমার বাবা যৌতুক দেবেন না সেটা আমরা আগে বুঝতে পারিনি। তবে সত্যি বলছি তোমাকে দেখার পর আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

– তোমরা যে যৌতুক চাও সেটা মুখ ফুটে বল নাই কেন? তা হলে বিয়ের আগে একটা ফয়সালা হয়ে যেতো?

–এসব মুখ ফুটে বলতে হয়না ধরে নিতে হয়। থাক এসব কথা, অন্য কথা বল।

মেহরুবার কাছে শহীদকে কখনো কখনো মনে হয়েছে ক্লীব, ভীতু। কেন মায়ের অযৌক্তিক দাবীর প্রতিবাদ করেনা? কেন ভাইবোনদের ঠেস দেওয়া কথা বলাকে প্রশ্রয় দেয়? শহীদকে বুঝতে কষ্ট হয় মেহরুবার।কখনো অনুরাগ, কখনো রাগে শহীদ তার কাছে অচ্ছেদ্য বন্ধনরূপে জড়িয়ে থেকেছে। শহীদকে ঘৃণা করতে পারেনা মেহরুবা। ওর ভালবাসার কাছে আত্মসমর্পন করেছে অসহায়ের মতো।

– তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ, আমাকে লেখাপড়ার অনুমতি দাও। এভাবে থাকলে আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো।

– আমার আপত্তি নেই, তুমি মাকে রাজী করো। মা–ভাইবোনদের খুশী করে তুমি পড়তে চাইলে আমি অমত করবোনা।

মেহরুবা বলেঃ আমার হয়ে এই অনুমতিটা তুমি নিয়ে দাও। কথা দিচ্ছি, তোমাদের পাওনা আমি কিছু কিছু শোধ দিতে চেষ্ট করবো।

শহিদ বলে–ছিঃ ওভাবে বলোনা! দেখি আমি চেষ্টা করো।

www.pathagar.com

অনার্স পরীক্ষার পর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর রেজাল্ট আউট হয়। ফার্স্ট ক্লাশ থার্ড হয়েছে শুনে শ্বশুর বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য একটু মর্যাদা লাভ করে। শ্বাশুড়ী না–না করেও পরে রাজী হন। সংসারের কাজকর্মের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অনেক কষ্টে মেহরুবা ক্লাশ করে। অল্প সময়ই পেতো নিজের জন্য। তবু মেহরুবার মন অনেক পাওয়ার আনন্দে ভরে উঠেছিল। লেখাপড়ার সময়টুকু সে বিভোর হয়ে থাকতো। শহীদ মৃদু অনুযোগ করত।

–সবাইর জন্য তুমি সময় দাও। শুধু আমিই তোমাকে পাইনা। মেহরুবা বই ফেলে উঠে আসতো। গভীর রাত্রে শহীদ যখন গভীর ঘুমে বিভোর, মেহরুবা উঠে পড়া তৈরী করতো। এ যেন এক অবিশ্বাস্য গল্পকাহিনী। এমন জীবন ছাড়াও যায়না, মানাও যায় না।

এমনি করে এ দুটো বছর পেরিয়ে গেল।

এম–এ'র ফাইনাল দেওয়ার পর শুভ'র জন্ম হয়। শহীদ একদিন হুট করে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নামে। মেহরুবা চায়নি শহীদ ব্যবসায় জড়াক। শহীদের তখন প্রচুর অর্থের দরকার। অর্থ এলো। দুটি বোনের বিয়েও দিল। মেহরুবা তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে–আরেকটা বছর, তারপরই অখন্ড সুখ!

সুখ নয় মেহরুবার মাথায় যেন বজ্রপাত ঘটল আচমকা। শহীদ এ্যারেষ্ট হলো। মেহরুবা কিছুই বুঝতে পারে না। শহীদ নিজেও হতভম্ব। মেহরুবার দিকে তাকিয়ে বলে–

তুমি বিশ্বাস করো, তোমার স্বামী কোন অন্যায় কাজ করতে পারেনা।

মেহরুবার চোখের সামনে পুলিশ অস্ত্রবোঝাই ব্রিফ কেস টেনে বের করে খাটের নীচ থেকে। যা আগে কখনো দেখেনি। মেহরুবা স্তব্ধ হয়ে যায়। শ্বাশুড়ী অজ্ঞান হয়ে যান। অস্ত্র মামলায় শহীদ জেলে যায়।

এর পরের ইতিহাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। কঠিন জীবন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে দুই রমনী। মেহরুবা ও তার শ্বাশুড়ী। জমানো অর্থ সম্পদ সব দিয়েও শেষ রক্ষা হলোনা। মেহরুবার বাবা এগিয়ে এসেছেন। আপ্রাণ চেষ্টার পর কারাবাসের মেয়াদ কমিয়ে আনলেন। উপার্জনক্ষম ছেলের অভাবে পরিবারে

www.pathagar.com

নেমে এলো অভাবের কালো ছায়া। সেদিন বাবার মেয়ে হিসাবে কলেজে একটা চাকরী তার জন্য আর্শীবাদ হয়ে নেমে এসেছিল। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে মেহরুবা যখন শ্বাশুড়ীর হাতে তুলে দেয় তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন।

–মা তুমি আমার ছেলের কাজ করলে। তোমাকে না বুঝে অনেক দুঃখ দিয়েছি। তোমার অবুঝ মেয়ে মনে করে আমাকে ক্ষমা করো।

–ছিঃ! ছিঃ! কি বলছেন মা! আমিতো কিছু মনে রাখিনি। আমাকে দোয়া করুন। আমি যেন এ দায়িত্ব বহন করতে পারি।

আপনি কিন্তু এখনও চিঠিটা খোলেননি ডঃ। এয়ার হোষ্টেস সেই মেয়েটি পাতলা একটি কম্বল নিয়ে মেহরুবার হাটুর উপর ছড়িয়ে দিল।মেহরুবা সচেতন হন। তাইত চিঠিখানা এখনও খোলা হয় নি। আজ কিযে হয়েছে তার অতীত স্মৃতি রোমন্থনে বেশী সুখ পাচ্ছেন তিনি। আর ক ঘন্টা পরেই ত বিমান ঢাকার বুকে অবতরণ করবে। ক'ঘন্টা পরেই প্রিয় স্বামীকে, চোখের মনি শুভকে দেখতে পাবেন। শুভ বড্ড জেদী বড় অভিমানী হয়েছে। মেহরুবা ভাবেন দেশে ফিরে শুভকে সঙ্গ দেবেন বেশী বেশী করে। এতদিনের অনুপস্থিতি সব মুছিয়ে দেবেন বুকের কাছে টেনে নিয়ে।

চিঠিখানা নিয়ে কি–করবেন ভেবে পান না। একবার ভাবেন চিঠিখানা না পড়েই বিমানে রেখে যাবেন। রায়ানের ভালবাসার কথা, বিষন্নতার কথা না জানলেই ভালো। নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন তিনি। অতীতের কোন বেদনার ছায়া তার উপর কেন পড়বে। তবু চিঠি খানা খুললেন–

My dear Ruba

ক'ঘন্টা পরেই তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হবে। আনন্দ উচ্ছ্বাসে তুমি যখন মগ্ন হবে, আমি তখন ভগ্ন হৃদয়ে ভিয়েনায় ফিরে যাচ্ছি। আমার জন্য কেউ অপেক্ষায় থাকবে না। কোন অশ্রু কিংবা ফুলের মালা কিছুই নয়। আমার ভালাবাসা, আমার হৃদয়, তুমি না চাইলেও তোমাকে দান করে আমি আজ রিক্ত, নিঃস্ব।

যদি কখনো প্রয়োজন হয় আমাকে ডেকো আমার ঠিকানাটা রাখো....।

ইতি

রায়ান

www.pathagar.com

অনাদৃত বন্ধুর উদ্দেশ্যে মেহরুবা হৃদয়ের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দিতে চাইল। রায়ান তুমি ভালো থেকো। তোমার খুব সুন্দর একটি বৌ হবে। খুব ভাল বাসবে তোমায়। বন্ধু আমার, আমি প্রার্থনা করছি আমাকে ভালবাসার কষ্ট তুমি খুব শিগ্‌গীর ভুলে যাবে–তুমি সুখী হবে। না তোমার ঠিকানার প্রয়োজন আমার কোনদিন হবে না, তাই আমি এ চিঠি হারিয়ে ফেলব ইচ্ছে করেই। মেহরুবা সীটটা পিছনে ঠেলে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন। ঘুম আসছেনা কিছুতেই। চোখ বুজলে নানা ছবি, নানা ঘটনা মিছিল করে চোখের–সামনে ভেসে উঠছে।

সে সব দিনগুলি ছিল বড় অশান্তির, দুঃশাসনের দুঃসময় নেমে এসেছিল নিরীহ জনগণের উপর। কে অপরাধী, কে নিরপরাধী বোঝার উপায় নেই। কলমের আচঁড়ে, টাকার ঝঙ্কারে সব তখন একাকার। শহীদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারাবরণ করেছে। অপমানে বেদনায় শহীদ ভেঙ্গে পড়েছিল। মেহরুবা পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছে। দীর্ঘ ছয়টি বছর সংসারের বোঝা টেনেছে। শহীদকে হতাশা থেকে আগলিয়ে রেখেছে বুক ভরা ভালবাসা দিয়ে। ততদিন বিরূপ আত্মীয়রা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। এ যুগে এমন সতী লক্ষ্মী বৌ পাওয়া যায়না। মেহরুবা অনন্যা। মেহরুবা যা করেছে তার তুলনা নেই।

মুক্তি পেয়ে শহীদ মাথা হেট করে বলেছিল–আমাকে এমনি করে চির জীবনের জন্য ঋণী করে রাখলে রুবা?

–ছিঃ তুমি আমার স্বামী। এ সংসারও আমার । সবই ত আমি আমার জন্য করেছি গো এটাও বুঝনা।

শহীদ মেহরুবার দুই করতলে নিজের মুখ ঢেকেছে। মেহরুবা স্বামীকে কাছে টেনে রহস্যময় সুরে বলেছে–এত কাতর হয়োনা। ইচ্ছে করলে ঋণ শোধ দিতে পারো তুমিও।

–কি ভাবে?

–ধীরে বন্ধু ধীরে। মেহরুবার রহস্যময় কণ্ঠ।

তখনো কথাটা পাকাপাকি হয়নি। প্রিন্সিপাল আপা "মিনোসোটা" ইউনিভার্সিটির সাথে স্কলারশীপ নিয়ে কথা চালাচ্ছিলেন। সাত মাসের মধ্যে

www.pathagar.com

মেহরুবার নামে স্কলারশীপের চিঠি এসে গেল। সেদিন মেহরুবা খুশী হতে গিয়েও খুশী হতে পারেনি। দীর্ঘ দিন পর স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। বছর না ঘুরতেই পাঁচ বৎসরের জন্য সে চলে যাবে? একি সম্ভব?

–কেন সম্ভব নয়–ইচ্ছে করলেই সম্ভব। সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়। প্রিন্সিপাল আপা জোর দিয়ে বলেন। প্রিন্সিপ্যাল আপার কথারই প্রতিধ্বনি শহীদের মুখে–এমন সুযোগ নষ্ট করবে কেন? আমার জন্য ভেবোনা। আমি আছি মা আছেন, শুভ'র কোন কষ্ট হবে না।

–মেহরুবার মন সায় দেয় না। স্বামী–সন্তান–সংসার ফেলে বিদেশে গিয়ে ডিগ্রী এনে কি হবে? এইত বেশ আছি। শহীদ কাছে আছে। সংসারের সবাই এখন তার আপন জন। শুভর বাড়ন্ত বয়স, এ সব কিছু কি করে ছেড়ে সে যাবে?

আশ্চর্য! এবার উৎসাহ যোগায় শ্বাশুড়ী দেবর ননদ এরা।

–আমাদের জন্য তুমি অনেক করেছ ভাবী। এবার নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবোত...

–যাও মা। তুমি শুধু লক্ষ্মী বৌ নও। তুমি বিদুষী কন্যা। তোমাকে বাধা দিয়ে অপরাধী হতে চাইনে। যাও, নিশ্চিন্ত মনে যাও। আমরা আছি কোন অসুবিধা হবেনা...।

শহীদের ম্লান মুখ। যাবার সময় যত ঘনিয়ে আসে শহীদ ততই আকুল হয়ে ওঠে। শুভ মৌন মুখে সম্মতি জানায়। বিমানে উঠার সময় মেহরুবার মনে হয়েছিল চিরজন্মের মত সে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে বুঝি। কান্নার ঢেউ পাঁজর ভেদ করে উঠে আসতে চাইছে। তার হৃদয়, তার আনন্দ, তার সুখ সব ঢাকার বুকে রেখে বিমানে চেপেছে মেহরুবা।

আগের দিন রাত্রে দু'জনে পরস্পরকে জড়িয়ে অঝোরে কেঁদেছে। সেদিন মেহরুবার মনে হয়েছে আজ চোখের জলে যে সেতু বন্ধন রচিত হলো তা কোন দিন ছিন্ন হবার নয়। প্রবাসে সেই রাত্রির নিবিড় পবিত্র স্মৃতি তাকে সাহস যুগিয়েছে। পথ ভ্রষ্ট হতে দেয়নি।

www.pathagar.com

আবারো বিমান বালার কণ্ঠে মেহরুবার তন্ময়তা ভাঙে। ভোর হয়ে গেছে ভেজা তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়েছে এয়ার হোস্টেস। মাইক্রোফোনে ভেসে এলো পাইলটের ভরাট কণ্ঠস্বর,

আস্‌সালামু আলাইকুম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ঢাকা এয়ার পোর্টে নামতে যাচ্ছি। যাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। মেহরুবার বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হলো। আশা আনন্দ–ভয় সব মিলে এক অবিমিশ্র অনুভূতি। সারা শরীরে থর থর কাঁপুনি। বারে বারে বিদ্যুতের শিহরণ অনুভব করছে...। ছিঃ! কি হয়েছে এত নার্ভাস হওয়ার কি আছে। মেহরুবা নিজেকে সজোরে সংযত করতে চায়। বিমানের গতি মন্থর ও গর্জন উচ্চকিত হয়ে উঠল। এক সময় বিমান থামল। মেহরুবা স্থির বসে নিজের বুকের উঠানামাকে সংযত করতে চাইল। সবার শেষে বেরিয়ে এলো।

বিহ্বল চোখে চারিদিকে তাকিয়ে পরিচিত মুখ খুঁজল।

–তোমার ব্যাগটা আমাকে দাও। একেবারে সিঁড়ির কাছ হতে শহীদ কথা বলে উঠল।

মেহরুবার হৃদয় ছলকে একঝলক রক্ত মুখে উঠে এলো। আরক্তিম মুখে মৃদু কণ্ঠে বলে,

–এখানে কিভাবে এলে!

বিশেষ অনুমতি নিয়ে এসেছি। ওই দেখো তোমার কলেজের লোকজনরা এসে গেছে।

কিছুক্ষণের জন্য মেহরুবা ফুলের মালা ও অভ্যর্থনার চাপে হারিয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল আপার সস্নেহ আলিঙ্গন অন্যান্যদের ভাব উচ্ছ্বাসে মেহরুবা ধন্য বোধ করল। ওরা মেহরুবা ও শহীদকে বাসায় পৌঁছে দিল। মেহরুবা অধির হয়ে শহীদকে কাছে পেতে চাইল। তার তৃষিত চোখ জোড়া শুভকে খুঁজতে গিয়ে হতাশ হলো।

–শুভ কই?

মাসুমা এগিয়ে এল। মেহরুবা অবাক বিস্ময়ে দেখল, যে অনাথ মেয়েটিকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল। সেদিনের সেই শীর্ণ কায়া অপুষ্টিতে ভোগা

www.pathagar.com

মেয়েটির সারা দেহে যৌবন শ্রী যেন উপচে পড়ছে। পরিমিত সাজ সজ্জায় পরিচারিকা নয় এবাড়ীর মেয়ের মতোই লাগছে,

–মাসুমা কেমন আছিস। তোকে যে চেনাই যাচ্ছে নারে।

মাসুমা লাজুক হাসি হাসে।

–আপা আপনি কাপড় জামা বদলান আমি টেবিলে নাস্তা দিচ্ছি।

– তার আগে তোর ভাইজানকে ডেকে দেতো আর শুভ কই? শুভ কে দেখছি না যে?

–শুভ হোস্টেলে।

– কেন, হোস্টেলে কেন?

এই সময় শহীদ ঘরে ঢোকে।মেহরুবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,

– শুভকে হোস্টেলে পাঠিয়েছ, কই আমাকে আগে ত জানাওনি।

ওর সামনে এসএসসি পরীক্ষা। বাসায় নাকি ওর পড়ালেখার অসুবিধে হচ্ছে তাই জেদ করে হোস্টেলে গেল।

– আজ অন্তত ওকে আনিয়ে রাখতে পারতে! মেহরুবার কণ্ঠে অনুযোগ ফুটে ওঠে।

শহীদ প্রসঙ্গ পাল্টায়–তাতে কি? ওকে যে কোন সময় আনা যায়। তুমি এখন খেয়ে দেয়ে রেষ্ট নাও।

শহীদ আবারও বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ায়। মেহরুবা ছুটে গিয়ে শহীদের হাত ধরে বাধা দেয়।

– ওকি কোথায় যাচ্ছ?

– তুমি কাপড় পাল্টে নাও আমি ডাইনিং টেবিলে বসছি।

মেহরুবা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। দু'হাতে শহীদকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ গুজে দীর্ঘশ্বাস টেনে বলে,

– কতদিন... উঃ কতদিন তোমাকে দেখিনি। তোমার বুকে মাথা রেখে আমার বুক জুড়িয়ে গেল গো।

www.pathagar.com

– আপা টেবিলে চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি আসেন।

শহীদ বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো ছিটকে সরে দাঁড়ায়। মেহরুবা অবাক হয়।

– কি হয়েছে?

– মাসুমা আসছে, আমেরিকা থেকে এসে তুমি কি এটাকেও আমেরিকা ভাবছো ডঃ মেহরুবা? কিছুটা রাখ ঢাক অন্তত রাখো।

অপ্রত্যাশিত আঘাতে মেহরুবা বিবর্ণ হয়ে যায়। সে বোবা চোখে শহীদের দিকে তাকায়। জেল থেকে ফিরে যে উচ্ছ্বাস ছিল শহীদের দীর্ঘ পাঁচ বছরে পর মেহরুবাকে পেয়ে তার সহস্র ভাগের এক ভাগ উচ্ছ্বাসও নেই যেন। শহীদের কি হয়েছে? খাবার টেবিলে বসে নাস্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করে চিন্তিত মনে। মাসুমা এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। শহীদ কিছু পারিবারিক সমস্যার কথা তোলে। মেহরুবা কিছু শোনে, কিছু শোনেনা। এক সময় বলে–মাসুমা বড় হয়েছে ওর বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হয় দেখছি।

মাসুমা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। শহীদ গম্ভীর মুখে বলে, সেটা এখন না ভাবলেও চলবে। মেহরুবা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, না এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মা নেই। তোমার ভাই বোনরা দেখছি সব যার যার সংসারে। মাসুমাকে নিয়ে তুমি একলা ছিলে?

– হ্যাঁ তাতে অসুবিধা কি হয়েছে? শহীদ নির্বিকার কণ্ঠে বলে।

মেহরুবা অস্পষ্ট আশঙ্কা নিয়ে বলে–অসুবিধা তোমার হয়নি হয়েছে অন্য সকলের। তা নইলে যারা আমাকে কথা দিয়েছিল আমি না ফেরা পর্যন্ত আমার সন্তান স্বামী সংসারের দেখা–শোনা করবে তারা আজ কোথায়? কেন শুভ ঘরে না থেকে হোস্টেলে, জবাব দাও?

– কি জবাব চাও তুমি? আমি তাদের কাউকে তাড়িয়ে দিইনি।

হ্যাঁ আমি মাসুমাকে বিয়ে করেছি। তাতে তারা যদি কষ্ট পায় আমি কি করতে পারি! এ সংসারের পিছনে মাসুমার অবদান কম নয়। তোমার অনুপস্থিতিতে এ সংসারের জন্য সে খেটেছে। শুভকে মানুষ করেছে। হাঁপানী রোগী মায়ের সেবা করেছে। ভাইবোনদের হাজারো ফরমায়েস রেখেছে। আমি তার সামান্য প্রতিদান দিয়েছি মাত্র!

www.pathagar.com

মেহরুবার পায়ের তলার মাটি সরে সরে যাচ্ছে। পা বাড়ালেই গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাবে যেন। হৃৎপিন্ড এতজোরে লাফাচ্ছে যেন এক্ষুনি ফেটে যাবে। মেহরুবা কথা বলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু শব্দ বেরোয়না। মেহরুবার কান জুড়ে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জন ধ্বনি–আমি মাসুমাকে বিয়ে করেছি... আমি মাসুমাকে বিয়ে করেছি। চারিদিকে এত প্রচন্ড গর্জন মেহরুবার মনে হচ্ছে শহীদ তার চীৎকার শুনতে পাচ্ছে না।

শহীদ সশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মেহরুবা কেঁপে ওঠে। শহীদকে কিছু বলার জন্য ঠোঁট নাড়ে। ওর রক্তহীন ফ্যাকাশে ঠোঁট থেকে যে অব্যক্ত ধ্বনি ওঠে তা শহীদ শুনতে পায়না। অমানুসিক চেষ্টায় মেহরুবা উঠে দাঁড়ায়। শহীদকে বাধা দিতে হবে সে যেন চলে না যায়। মেহরুবা দুহাত বাড়িয়ে শহীদের কাছে আসতে চায় কিন্তু তাদের দুজনের মাঝখানে যে অতল গহ্বর তা পাড়ি দিয়ে মেহরুবা শহীদের কাছে পৌঁছুতে পারেনা।

মেহরুবা পা বাড়াতে চায়, কিন্তু সে দেখে তার যাবার কোন পথ নেই। চারিদিকের অতল গহ্বরের ভিতর হতে উঠে আসছে পৈশাচিক আগুনের লেলিহান শিখা। সেই আগুনে পুড়ে যাচ্ছে মেহরুবার স্বপ্ন-সাধ, ভালবাসার ঘর। তাঁর সাধের সংসার তার স্বামী সন্তান সব--সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। স্পর্শাতীত সেই ভয়ঙ্কর আগুন তার বোধ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে কুয়াশার মতন নেমে আসছে। যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে তার সারা দেহে। মূক বধির–অশ্রুহীন মেহরুবা বজ্রপাতে দগ্ধ পত্রকান্ডহীন নিরলম্ব বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে পুড়তে থাকে নিঃশব্দে।

www.pathagar.com

ভিন্নস্রোত

রাজধানীর কোলাহলকে পেছনে ফেলে মীরপুর রোড ধরে এগিয়ে গেলে একটু ফাঁকা নিরিবিলির দেখা মেলে। মীরপুর রোডের শেষ মাথায় বার নম্বর সেকশন।

বাস ডিপোর উল্টোদিকে বাঁ দিকের গলি দিয়ে ঢুকলেই দেখা যাবে সেই প্লানড্ ফ্লাট বাড়ীগুলো। এই এলাকাটা পল্লবী নামেই পরিচিত। সারি সারি সাজানো বাড়ীগুলো রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে আছে ঐশ্বর্য্য এবং আভিজাত্যের নব্য ধারাবাহিকতা নিয়ে। আশেপাশে এবং লেকের কিনা ঘেষে দুএকটি প্রাইভেট বাড়ীও উঠেছে নিজস্ব সুক্রশ্য ঢঙে। এ বাড়ীগুলোর ব্যতিকৃমধর্মী নির্মাণ কৌশল, সুদৃশ্য ডিজাইনের কোলাপসিবল গেট, গেটের ভিতর শৃঙ্খলাবদ্ধ এ্যালসেশিয়ানের সরব উপস্থিতি। সবকিছু চমক ধরানোর মত। এমনি একটি বাড়ীর মালিক মিসেস আয়েশা খাতুন।

স্বামী মৃত্যুর আগে দেশের জমি-জায়গা বিক্রি করে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে এ বাড়ীর কাজ শুরু করেছিলেন। স্বামী গাফফার সাহেবের বিন্দু বিন্দু শ্রমে যে বাড়ীটি গড়ে উঠেছিলো তার শেষ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। বাড়ীর তদারকীর কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতে গিয়ে যন্ত্রদানবের শিকার হয়ে আকস্মিকভাবে প্রাণ হারান। স্বামীর অকালমৃত্যু আয়েশা বেগমকে অনিশ্চিত জীবনের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। বাড়ীর কাজ তখনো অনেক বাকী। ছাদের ঢালাই চলছিল। ওয়্যারিং, দরজা-জানালার কাঠের কাজ, স্যানিটারী-অনেক কিছুই তখন বাকী। একমাত্র পুত্র আশফাক তখন বুয়েটের শেষ বর্ষের ছাত্র। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তিন মেয়ের বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল। তারপরও চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন মিসেস আয়েশা খাতুন। কারণ আয়ের একমাত্র উৎস ছিলেন স্বামী। ভাইদের সহায়তায় অনেক তিমির রাত্রি পাড়ি দিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছেন। এই এতদূর পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস বড় করুণ, বড় দুঃখের।

www.pathagar.com

আশফাক ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। ফার্স্টক্লাশ সেকেন্ড হয়েও চাকরি নিলনা। কয়েক বন্ধু মিলে ফার্ম করল। অসমাপ্ত বাড়ীর কাজ শেষ করল। বছর তিনেক না যেতেই ধনীর দুলালীকে বিয়ে করে বসলো। আশফাককে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। তার স্বপ্ন ভাঙতে বেশী সময় লাগেনি । বোনরা যখন প্রবল উচ্ছাস নিয়ে ভাইয়ের জন্য কনে খোঁজাখুজি করছিল আশফাক তা জানতে পেরে নিজেই ওদের বারণ করে দিল। তার কদিন পরেই সুশ্রী চেহারার দারুণ স্মার্ট এক মেয়েকে ঘরে নিয়ে এলো। প্যান্ট শার্ট পরিহিতা বড় বড় চুলের ঐ মেয়েকে দেখা মাত্র আয়েশা বেগম বুঝতে পারলেন এই তার ভাবী পুত্রবধু।

তাঁর বুক জুড়ে থাকা স্বপ্নটা ঝুরঝুর করে ভেঙে গেলো।

সেদিন ছেলের সাথে কি কথা হয়েছিল কিছুই আজ মনে নেই। তার কান জুড়ে তখন সহস্র বোলতার গুঞ্জন, হৃদয় জুড়ে ঝনঝা–বিক্ষুব্ধ সাগরের অশান্ত ঢেউ। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেকে বুকে নিয়ে স্বামীর শোক ভুলেছিলেন, সেই ছেলের পছন্দ দেখে সেই যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন আর মুখ খোলেননি। ভিতরে কোথায় যেন একটি দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। যা পরবর্তীতে তাকে নিষ্ফল আশা থেকে নিবৃত্ত করেছিল।

যন্ত্রচালিতের মত ছেলের বিয়ে দিলেন। ঘরে বৌ আসার সাথে সাথে ঘর জুড়ে তুমুল পরিবর্তন–কর্তন বর্ধন শুরু হয়ে গেল। পুরানো প্রিয় যা ছিল সব কিছু পাল্টে গেলো। আশফাক ফার্ম নিয়ে ব্যস্ত রইল। এই ফার্মে তার শ্বশুরের শেয়ার ছিল। ঘরে বাইরে আশফাক শ্বশুরের কেনা হয়ে রইল। দেখেশুনে আয়েশা বেগম বৌ এর হাতে সবকিছু স্বেচ্ছায় তুলে দিয়ে সরে গেলেন নিজের নিভৃত শয়ন ঘরে। মনকে প্রবোধ দিলেন এ ভালই হলো। সংসার মুক্ত হয়ে বিধাতার প্রার্থনায় নিজেকে উজাড় করে দেবেন। ওরা সুখী হোক। তিনি আর কদিন বাঁচবেন। হায়রে সংসার! মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার হাত হতে নিস্তার নেই। সরতে চাইলেও সরা যায়না । জীবনের সহস্র প্রয়োজনে সংঘাত বেজে ওঠে।

মেয়েরা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। দু'চারদিন থেকে যায়, তাতেই রেষারেষি–কথা কাটাকাটি। মেয়েদের পর্দানশীল চলাফেরা বধুর পছন্দ নয়।

www.pathagar.com

বোনদেরও পছন্দ নয় ভ্রাতৃবধুর অতিরিক্ত খবরদারি। মায়ের অযত্ন তারা সইতে পারেনা। মেয়েরা টানাটানি করে–চলো মা আমার কাছে থাকবে। তিনি রাজি নন। মেয়েদের বোঝান, বধুকে বোঝানো যাবেনা। বধুর সাফ জবাব, গেষ্টদের সামনে বোন কিংবা বোনের ছেলেমেয়েরা যেন না আসে। ওদের ওই পর্দা কবার জন্য সোসাইটিতে তার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত বাঙ্গালীপনা ব্যাক ডেটেড ছাড়া আর কিছুই নয়।

শেষাবধি আয়েশা বেগমকে একটু কঠোর হতে হয়। ছেলেকে, বৌমাকে ডেকে বলেন,

–আশফাক বৌমার যদি এ বাড়ীতে থাকতে অসুবিধা হয় তুমি অন্যবাড়ী খুঁজতে পারো। তুমি আমার একমাত্র পুত্র সন্তান। বলতে গেলে একমাত্র অভিভাবক, তারপরও বলছি তোমাদের যেখানে খুশী থাকতে পারো। ভেবোনা আমি তোমাকে আটকে রেখেছি। আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

আশফাক বিব্রত বোধ করে । মায়ের পায়ে হাত ছুঁইয়ে বলে,

–মা এরকম চিন্তা আর কখনো করবেনা, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবোনা। তোমাকে ফেলে কোনদিন কোথাও যাবোনা মা–বিশ্বাস করো।

এতদিন আয়েশা বেগম বৌ এর কত কটুবাক্য শুনেছেন কিছুই হয়নি। আজ আশফাকের মুখের এই কথায় অশ্রু আর বাধা মানলোনা। ঝরঝর করে দু'চোখের পানি ঝরে পড়লো ছেলের মাথায়।

সেদিন হতে এ বাড়ী ভাগ হয়ে গেলো। তেতলায় ভাড়াটে। দোতালায় বৌমা, একতলায় আয়েশা বেগম। আশফাক জোর করে রান্নাঘর, খাবার ঘর মায়ের কাছে একতলাতেই রাখালো। মা বুদ্ধিমতী তিনি বৌকে বলে দিলেন দোতলাতেও যেন রান্না–খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকে। বৌমা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। দূরে সরে আলাদা বাসার স্বপ্ন দেখছিল। আশফাকের জন্য কোনদিন হয়ত সম্ভব হতনা, এই অবস্থায় তাই তাকে উৎফুল্লই দেখা গেল, যা দেখে মায়ের চোখে বেদনার ছায়া নামে।

তিনি বড় হতভাগিনী। এত দীর্ঘ হায়াত নিয়ে কেন যে একা একা বেঁচে আছেন। সময় কেমন গড়িয়ে যায়–বছরের পর বছর। মনে হয় এইত সেদিন

www.pathagar.com

ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখেছিলেন। ক মাস ঘুরতে না ঘুরতেই আবার রমজানের চাঁদ ওঠে। এর মধ্যেও কোথায় যেন জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পান। বৌমার কোল জুড়ে আসা দু'টি শিশু আয়েশা বেগমের জীবনে আলোর ঝর্ণাধারা হয়ে নামে। এ দু'টি শিশুর জন্য বৌমার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। তার সকল রূঢ়তা তার কাছে ক্ষমা পেয়ে যায়, বাপী-পপিকে উপহার দেওয়ার জন্য।

শেষ বয়সের সকল অভিজ্ঞতা-মমতা নিয়ে শিশু দু'টিকে কাছে টানতে চেয়েছিলেন, পরিচর্যা করতে চেয়েছিলেন। তা হলোনা। তার চাইতে বৌমার কাছে অর্ধশিক্ষিত আয়াই বেশী উপযুক্ত। বৌমা সারাদিন বাইরের কাজে ব্যস্ত। তবু বাচ্চার ভার শ্বাশুড়ীকে দিতে চায়না। তিনি স্বেচ্ছায় সময় দিতে চেয়েছিলেন। বৌমা চায়না বাচ্চারা দাদীর সাথে মিশুক। তিনি অশিক্ষিত নন। তবে কেন বৌমা এমন করে? বৌমার একলা শাসন তোষণে ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের দিকে চাইলেও তার বুক দুরু দুরু কাঁপে। কোথায় যেন মস্তবড় ফাঁকি-খেলা চলছে যা তিনি ধরতে পারছেন না।

বাপীর কথাবার্তায় চলাফেরায় উদ্ধত রাগী-রাগী ভাব। আঠার বছরের টগবগে তরুণ। লেখাপড়ার চাইতে খেলাধূলা, জগিং, ভিসিআর নিয়ে সময় কাটায় বেশী। প্রতি বছর ফেল করে। বৌমা এক স্কুল হতে অন্য স্কুলে ভর্তি করায়। এক মাষ্টার হতে অন্য মাষ্টার। দিনে দিনে প্রাইভেট টিউটরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবু ইপ্সিত রেজাল্ট করে না বাপী। ইদানিং কিযে হয়েছে, আগের চাইতে একটু শান্ত কেমন যেন অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে বাসায় যতক্ষণ থাকে ঘুমিয়ে কাটায়। প্রশ্ন করলে লাল ঢুলঢুলু চোখ তুলে তাকায় জবাব মিলে না। আগে মাকে লুকিয়ে প্রায় প্রতিদিন দাদীর কাছে একবার আসতো।এখন আর আসেনা। ওর বন্ধুর সংখ্যাও বেড়েছে।

আর ফুলের নামে নাম যে মেয়েটা পপি। আহা কি কোমল! আর সুন্দর মেয়েটি। দাদীর বড় ন্যাওটা ছিল ছোটবেলায়। যখন তখন ঘরে এসে দাদীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতো-দাদু সূচ রাজার গল্পটা আর একবার বলো না।

আয়েশা বেগমের বুক চিরে হু-হু করে দীর্ঘশ্বাস বেরোয়। দশবছরের পপি দাদীর কাছ হতে নামাজ পড়া শিখে নিয়মিত পড়তো। সেই পপি পনেরোয়

www.pathagar.com

পা দিয়ে কিযে হয়ে গেল। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করলে পোষাকে চলনে বলনে কি ইংরেজ হতে হয়?

বৌমার ধারণা ইংরেজী ভালভাবে রপ্ত না করলে ছেলেমেয়েদের বাংলাদেশে পচে মরতে হবে। বিদেশে গিয়ে ভাল চাকরিবাকরি জোটাতে তারা সমর্থ হবেনা। ইংরেজী ভাল রপ্ত করুক। একটা বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করুক তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু নিজের ধর্ম নিজ দেশের সংস্কৃতি মূল্যবোধকে কেন বর্জন করবে। কেন মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের সাধনা করে দেশের একজন হয়ে দেশে থাকতে চায়না। এখানকার ছেলে মেয়েদের চাইতে অভিভাবকরাই বেশী প্রলুব্ধ হচ্ছে বিদেশ গমনের প্রতি। একি শুধু নির্বিঘ্নে উচ্চ শিক্ষা লাভ কার জন্য নাকি ডলার পাউন্ড ইয়েনের বাজার দর বেশী বলে তা লাভ করার জন্য প্রান্ত চেষ্ট চালিয়ে যাওয়া? জন্মভূমির প্রতি চৌদ্দপুরুষের পিতৃভূমির প্রতি কোন আকর্ষণ কি জাগবেনা এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের। তাদের অভিভাবকদের কোন দায়, কোন ঋণ কি প্রতিনিয়ত তারা গ্রহণ করছেনা এদেশের মাটি আলো হওয়া থেকে।

আর কতদিন চোখ বন্ধ করে থাকবে। অনুশীলন নয় শুধু অনুকরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা সবখানে। বৌমা শিক্ষিত মেয়ে এম.এস. সি পাশ। সেই যদি বাচ্চাদের আত্মমর্যাদা বোধ না শেখায় তাহলে আর শেখাবে কে? যে যতবেশী চলনে বলনে ইংরেজী জানার পরিচয় দিতে পারবে সেই তত বেশী আধুনিক। আয়েশা বেগম আর কি করতে পারেন? তারই চোখের সামনে দিয়ে তার উত্তরাধিকারীরা ভিন্ন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তাদের কি দিয়ে ঠেকাবেন।

–দাদী আম্মা আপনার গোসলের পানি ঠান্ডা হয়ে গেল গোসল করবেন না? ঝি করিমনের ডাকে চমক ভাঙ্গে আয়েশা বেগমের। সেই কোন সকালে নাস্তা সেরে ছোট বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে বসেছিলেন। এতক্ষণ তন্ময় হয়ে নিজের ভেতর ডুবেছিলেন। চমক ভেঙ্গে জিজ্ঞেস করেন।

–হ্যারে করিমন আজ বাজার এসেছে? কি রান্না হয়েছে?

করিমন ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে জবাব দেয়–না আজ বাজার হয়নি। ওপর তলা থেকে আপনার খানা আসবে। আজকে বহুত মেহমান আসবে কিনা?

www.pathagar.com

–মেহমান আসবে কেনরে? করিমন ঝাড়ু দেওয়া থামিয়ে ফিক করে হেসে বলে,

– জানেন না আজ খালাম্মা–খালুর বিবাহবার্ষিকী?

– ও তাইতো! তা পপি বুজি কোথায় রে?

– আফায়ত সকালে বাপী ভাইয়ার লগে কোথায় জানি গেছেন এখনও ফেরেন নাই। কথা শেষ করে করিমন নিজের কাজে মন দেয়।

আয়েশা বেগমের মনে ঈষৎ দুশ্চিন্তা জাগে, ষোল বছরের বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে। এখনও স্কার্ট-টপ্স পরে ঘুরে বেড়ায়। কখনও টাইট জিনস শার্ট। মুখে সারাক্ষণ ইংরেজী গান। ক্লাশে বরাবরই ভালো রেজাল্ট করে। ভাইয়ের বিপরীত। ইদানীং পড়ালেখার চাপ বেড়েছে বলে ওপর তলার ষ্টাডি রুমেই ঘুমিয়ে পড়ে। আয়েশা বেগমের বড় একা আর ফাঁকা লাগে। তাই রাত্রে তার ঘরে শুতে বলেন।

– দাদী আম্মা তাড়াতাড়ী যান। পানি এক্কেবারে ঠান্ডা হই গেছে।

– এই যাই।

খেয়ে দেয়ে নামায পড়ে আয়েশা বেগম আবারও বারান্দায় এসে বসেন। অনেক গাড়ী এসে জমা হয়েছে। মেহমানরা সবাই উপরে। ওদের মিলিত কণ্ঠের হাসি, কথা ভেসে আসছে। নানা পদের রকমারী খাবারের আয়োজন করেছে বৌমা। এত ঘি–মশলা আজকাল আর সহ্য হয়না। তাই সামান্যই মুখে দিয়েছেন। বাড়ীতে আজ উৎসব অথচ ছেলে–মেয়ে দুটো এখনও ফিরলনা। আয়েশা বেগম করিমনকে উপরে পাঠান।

– যাও দেখে এসো ওরা এখনও ফিরলনা, বৌমাকে খোঁজ নিতে বলো।

করিমন ফিরে এসে বললো,

– খালাম্মা আপনারে চিন্তা করতে নিষেধ করছেন। ওরা সময় মত ফিরবে।

আয়েশা বেগম তসবিহ হাতে নিয়ে পায়চারী করতে থাকেন। আজ আর খাওয়ার পর বিছানায় গড়িয়ে নিতেও মন চাইছেনা। গাফফার সাহেবের বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর হতে সময় মতো কেউ না ফিরলে তিনি আর সুস্থির

www.pathagar.com

থাকতে পারেন না। ঘর বার করতে থাকেন। গেটের দিকে প্রতীক্ষিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন অশান্ত মন নিয়ে। নাহ্ আসরের সময় হয়ে এলো। ঘরে গিয়ে সামাজ আদায় করেন। এক সময় মাগরেবের সময়ও ফুরিয়ে গেলো। দুশ্চিন্তায় কন্টকিত হয়ে উঠেছেন তিনি।

অতিথিরা যেতে শুরু করেছেন।

আয়েশা বেগম নিজেই দোতলায় উঠে এলেন। রাত আটটা বেজে গেছে। ওরা তখনো ফেরেনি। চিন্তার ছায়া দ্রুত নেমে এলো সবার মাঝে। বৌমা আশফাক অবিরাম ফোন ঘোরাচ্ছে। কেউ পপির কোন খবর দিতে পারছে না।

রাত নটায় বাপী ফিরলো। পপির নিখোঁজ সংবাদে হতভম্ব হয়ে গেলো সে। নিজে পপিকে হোন্ডায় করে নিয়ে গিয়ে স্কুল গেটে নামিয়ে দিয়েছে। বারটায় ক্লাশ শেষ। কোথায় থাকতে পারে? তবে কি যেন বিপদ আপদ? এক্সিডেন্ট হলেও ত এতক্ষণে খবর এসে যাওয়ার কথা। তাহলে? কি হতে পারে? কোন শত্রুতা, বাপীর কোন বন্ধুর কারসাজি,কোন হেরে যাওয়া বন্ধুর প্রতিশোধ? বাপীর চিন্তার জগতে দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। কি হতে পারে? কে বা কারা হতে পারে? বাপীর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। চোখে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে ছুটে ঘর হতে বেরিয়ে যায়।

আশফাক অনন্যোপায় হয়ে পুলিশে খবর দেয়। একটু আগে আনন্দের কলতানে যে বাড়ীটি মুখর হয়ে উঠেছিল মুহূর্তের ব্যবধানে সে বাড়ীতে আতঙ্কের কালোছায়া নেমে এলো। পুলিশ কমিশনার নিজে এসে পপির খবরাখবর ও ছবি নিয়ে গেলেন। আশ্বাস দিলেন ঘন্টা তিনেকের ভিতর খোঁজ দিতে পারবেন। পুলিশের ইনভেষ্টিগেশন দল শহরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রুদ্ধশ্বাসে সকলে প্রহর গুনতে লাগলো। মনের ভিতর ভরসা কিংবা আশ্বাস কিছুই অনুভব করতে ছন না আয়েশা বেগম। হৃদয়ে শুধু অবিরাম রক্তক্ষরণই অনুভব করতে লাগলেন। তার দু'চোখে পানি টলমল। বৌমার প্রসাধিত মুখে উৎকণ্ঠার কালো ছায়া। থেকে থেকে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। আশফাক গম্ভীর। সমস্ত বাড়ীটি নীরব হয়ে আছে। মাঝে মাঝে

www.pathagar.com

আত্মীয় স্বজনের উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা নিয়ে ফোন বেজে উঠছে। আবার ফোন বেজে উঠতেই বৌমা ফোন উঠায়,

– আমি পপির বান্ধবী শম্পা।

– কোন খোঁজ পেলে?

– না আন্টি, তবে একটা কথা মনে এলো। কিছু মনে করবেন নাতো।

– না, না। বলো শম্পা, যা জানো সব বলো।

পপি নিষেধ করেছিল এখন না বলে পারছিনা। পপি আজ ক্লাশ করেনি।

– বলো কি।

– হ্যাঁ ক্লাশ শুরু হওয়ার আগেই চলে গেছে।

– সে কি, কার সাথে?

– আমি চিনিনা। দু'টি ছেলে প্রায়ই হোন্ডা নিয়ে স্কুলে গেটে আসত। লাল রঙের হোন্ডায় করে পপিকে ওদের সাথে যেতে দেখেছি। বৌমা পাংশু মুখে কথাটা জানায়। আশফাক বেদনায়, ঘৃণায় আর্তনাদ করে ওঠে।

– মা শুনলে আমার স্কুল গোয়িং মেয়ে তার ছেলে বন্ধুর সাথে ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে বেড়াতে গেছে। এযে আমি কখনও ভাবতেও পারিনা মা।

আঁচলে চোখ মুছে আয়েশা বেগম ছেলের মাথায় হাত রাখেন,

– ধৈর্য ধরো বাবা, কমিশনার সাহেব যা করার করবেন। বাপী কোথায় গেলো? ওর যা মাথা গরম, কিনা কি করে বসে?

আশফাক সচকিত হয়ে বৌএর দিকে তাকায়

– বাপীকে যেতে দিলে কেন?

– আমি যেতে দিয়েছি মানে? সেকি কারও কথা শোনে?

– তোমার কথা শোনেনা কই আগে কখনো বলোনি ত।

– আমি বলতে যাব কেন, তোমার চোখ থাকলে দেখতে, কান থাকলে শুনতে, আমাকে জিজ্ঞেস করতেনা।

www.pathagar.com

– লিজা! আমি তোমার কথামত সবকিছু তোমার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত ছিলাম। তোমার পছন্দ মাফিক ছেলে মেয়েদের মানুষ করছ। এমনকি লেখাপড়া নিয়ে কথা উঠলেও বলেছ ওনিয়ে তোমার ভাবতে হবেনা। আজ একি শুনছি, তুমি আমাকে সবদিক হতে আড়াল করে শুধু টাকা বানাবার মেশিনে পরিণত করেছ। তার পরিণতি কি ঘটতে যাচ্ছে তুমি তা ভাবতে পারো।

লিজা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

– তুমি সুযোগ পেয়ে আমাকে অপমান করছো। আমার মেয়েটা কোথায় আছে তার কোন খোঁজ না নিয়ে আমার কাছে কৈফিয়ত চাইছ?

আয়েশা বেগম দু'জনকে থামিয়ে দেন।

– বাবা এখন এসব বলার সময় নয়। অনেক আগেই তোমার ছেলে-মেয়েদের দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। পিতা হিসাবে তোমার দায়িত্ব তোমার নিজের। বৌমা কদিক সামলায়? সংসারের সকল ভার দু'জনকে একসাথে বইতে হয়। এখন এসব যাক। তুমি একবার কমিশনারকে ফোন করো।

সে রাত্রে কারও খাওয়া হলো না। আশফাক গাড়ী নিয়ে বের হয়ে মধ্যরাতে ফিরে এলো একাকী। কোন খোঁজ নেই। পুলিশ কোন কিনারা করতে পারছেনা। বাপীও ফিরছে না। বাপী সম্পর্কে যে খবর আশফাক নিয়ে এসেছে তা আরও মর্মান্তিক। বাপী ড্রাগ এডিকটেড! আশফাক ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় ছেলেমানুষের মত হাউ-মাউ করে কাঁদছে। লিজার প্রতি তীব্র ঘৃণায় আশফাকের অন্তর ছেয়ে যায়। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলে,

– লিজা, প্লীজ তুমি আমার সামনে এসো না। সরে যাও আমার কাছ হতে। আমি তোমার মুখ দেখতে চাইনে!

ঘরে-বাইরে যেন ভাঙনের সর্বনাশা বন্যা শুরু হয়েছে। ভয়ের যে কালো ছায়া মাঝে মধ্যে মনে ছায়া ফেলত আজ তো আজরাইলের চেহারা নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। আয়েশা বেগম দিশেহারার মত একবার ছেলের কাছে, একবার বৌ এর কাছে দাঁড়ান। বৌমার শক্ত মনও ভেঙ্গে গেছে। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে। কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল

www.pathagar.com

নির্জীবের মত বিছানায় পড়ে আছে। আয়েশা বেগম জায়নামাজে উপুড় হয়ে প্রার্থনা জানান সর্বশক্তিমানের নিকট।

– আল্লাহ তুমিই একমাত্র ভরসা। উদ্ধার কর এই মহাবিপদ হতে। অসহায়ের সহায়, দুর্বলের বন্ধু। হে আল্লাহ, ওদের ফিরিয়ে দাও।

– মা... মাগো!

লিজা ওপর হতে নেমে আসছে। এলোমেলো শাড়ী পরা আলূ থালূ বেশ। দরজার কাছে এসে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে।

– মা আমি আর সইতে পারছিনা... ওরা কেন ফিরছেনা বলো মা...।

আয়েশা বেগম পরম স্নেহে লিজাকে বুকে টেনে নেন–ধৈর্য ধরো মা, আল্লাহকে ডাকো। তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। তিনিই একমাত্র ভরসা!

লিজা জায়নামাজে মাথা ঠুকতে থাকে–আল্লাহ আমার বাচ্চাদের ফিরিয়ে দাও। আমার পাপের শাস্তি আমাকেই দাও। ওদের ক্ষমা করো আল্লাহ্ আমার বাচ্চাদের আমার বুকে ফিরিয়ে দাও..ফিরিয়ে দাও..।

আয়েশা বেগম জোর করে লিজাকে শুইয়ে দেন। দু'টি ঘুমের বড়ি খাইয়ে লাইট নিভিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ান।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। হাল্কা কুয়াশার চাদর জড়িয়ে রেখেছে আশপাশের বাড়ী ঘরগুলোকে। আকাশে সহস্র তারার মেলা! চাঁদ ঢলে পড়েছে। আকাশের সর্বাঙ্গ হতে তরল রূপার মত জোৎস্না গড়িয়ে নামছে। কোথাও তেমন অন্ধকার নেই। বাড়ীর বাগানে ফুলগাছের ঝোপঝাড় গুলোতে কিছু অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। অদুরের বড় বড় বৃক্ষগুলোও কিছু অন্ধকারকে যেন জোর করে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছে। দিনের পৃথিবীর সূর্যের প্রদীপ্ত, আলো, রাতের চাঁদের মায়াবী আলো, কোন আলোয় মানব মনের অন্ধকারকে দূর করতে পারছেনা। সভ্যতার আলো অসুন্দরের কালিমাকে কেন মুছে দিতে পারবেনা? আয়েশা বেগমের বুকের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে। এত সুন্দর, এত গভীর এই রাত কিন্তু কি নিবিড় অন্ধকার তার হৃদয়ে। এই অন্ধকার তাঁর সংসারকে, তাঁর সমাজকে তার দেশকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। গড্ডালিকার প্রবাহে সবাই যেন নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। কারও কি কিছু করার নেই?

www.pathagar.com

সমস্ত বিশ্ব চরাচর গম্ভীর মৌনতায় ডুবে আছে। এখান হতে বড় রাস্তা বেশী দূরে নয়। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ীর হর্ণ নীরবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আয়েশা বেগম দূরের কুয়াশা জড়ানো প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ একটি গাড়ীর হেড লাইট দেখতে পেলেন। এলোমেলো গতিতে গাড়ীটি উঠে আসছে তাঁর বাসা লক্ষ্য করে। তিনি দ্রুত নেমে গিয়ে গেট খুলে ধরেন।

গাড়ী স্বগর্জনে ভিতরে ঢুকে থেমে যায়। আওয়াজ পেয়ে সকলে ছুটে আসে। স্টীয়ারিংয়ে মাথা রেখে বাপী বসে আছে। আশফাক ব্যাকুল চিৎকারে ডেকে ওঠে,

– বাপী ..বাপী বাপী...

মাথা তুলে গাড়ীর দরজা খুলে দেয়। বাপীর শার্ট প্যান্ট রক্তে ভেজা কপাল হতে তখনো রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে,

আব্বু ওরা ... ওরা পপিকে শেষ করে দিয়েছে। আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না।

– কই কোথায় আমার পপি?...

পিছনের সীটে রক্তাপ্লুত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পোষাকে পপি নিথর শুয়ে আছে। আশফাক দু'হাত বাড়িয়ে পপিকে কোলে নিতে যায়। তার আগেই লিজা পাগলিনীর মত চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে,

–পপি.. পপি.. আমার পপি এসেছে! আয় মা আমার বুকে আয়..আর কোন দিন তোকে কোথাও যেতে দেবোনা আয়!

লিজা আশফাকের গায়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

পপির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ধাক্কাতে থাকে– আহ ঘুমোচ্ছিস কেন? চোখ খোল মা.. ওঠ.. জেগে ওঠ!

www.pathagar.com

আশ্রয়

রাতের খাবার কোনমতে সেরে টিভি খুলে বসতে না বসতেই কলিংবেলটা জোরে বেজে ওঠে।

খবরের হেডলাইন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এখন আমার পক্ষে নড়া সম্ভব নয়। কারণ হেডলাইনটা মিস করতে চাইনা। পুরো খবর দেখার ধৈর্য্য আমার থাকেনা। একই রকম পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ খবর বিশবছর যাবৎ দেখে আসছি। যে সরকারই আসুক না কেন বিটিভির চরিত্র কখনো পাল্টায়না। একেবারে বশংবদ যাকে বলে! এ ব্যাপারে কোন আলোচনা সমালোচনায় কর্তৃপক্ষকে তাঁদের মহান দায়িত্ব থেকে একচুল পরিমাণও নড়ানো যায়নি, যাবেও না হয়ত কোনদিন। নিরপেক্ষ সংবাদ দেশের টিভি রেডিও থেকে আমরা জানতে পারা অসম্ভব ব্যাপার। এসব কারণে যতটা পারি সংবাদ সংক্ষেপ করে দেখি।

বেল বেজেই চলেছে একটু থেমে থেমে। আমার দৃষ্টি টিভি পর্দার বুকে। ঘোষিকার সুশ্রী মুখের দিকে। চমৎকার বাচন ভঙ্গি, পরিশীলিত সুমিষ্ট কণ্ঠে দ্রুত লয়ে খবর পড়ছে। আমি দেখছি, শুনছি আবার ভাবছিও। কে হতে পারে? এই ফ্লাটের সবাই জানে, আমার স্ত্রী দেশের বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন। অতএব ফ্লাটের কেউ নন। আমার মতো নীরস লোকের বন্ধু সংখ্যা কম। যে কজন আছেন তারা রাত আটটায় বেড়াতে আসার মতো বেরসিক নন। কারণ তারা প্রায় সকলে জানেন পৌনে আটটায় আমার খাবার সময়। তদুপরি গৃহিনী শূন্য ঘরে সমাদরের অভাব হেতু অনেকেই আসেন না... তাহলে কে এই উটকো অতিথি?

নাহ্! আর পারা যাচ্ছে না। বেলের সুমিষ্ট বাজনা শ্রবণ যন্ত্রের উপর তিক্ত চাপ দিচ্ছে তিন মিনিট ধরে কলিং বেল বাজছে। কেউ যখন খুলছেনা তখন বে-আক্কেলের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে চলে যাওয়াই কি স্বভাবিক নয়?

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

নাছোড় বান্দা অতিথির মুন্ডুপাত করতে করতে দরজার হুড়কো খুলতে না খুলতেই বন্যার পানির মত হুড়মুড় করে যিনি ঢুকে পড়লেন তাকে দেখে আমি রীতিমত হতভম্ব! ঢোকার সাথে সাথে খোল করতালের আওয়াজের মত প্রচন্ড ঝনঝন করে গ্রামের ভাষায় এক নাগাড়ে কথা বলে চলেছেন যিনি, তাকে আমি কোন দিন দেখিনি। অথচ সে অত্যন্ত আপনজনের মত খালুজান

www.pathagar.com

সম্বোধন করে কথা বলে চলেছেন দু'হাত নেড়ে। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে একটু ধাতস্ত হয়ে তাকাই।

উনিশ কুড়ি বছরের একটি তরুণী। রঙিন ঝলমলে আধময়লা একটি শাড়ী পরণে। শীর্ণ রোগা দেহে চোখে লাগার মত বক্ষ সম্ভার প্রসাধিত অথচ অবিন্যস্ত ফর্সা মুখ। চোখের কোলে লেপ্টানো কাজল–ঠোটেও ছড়ানো লিপষ্টিকের আভা। আমার সারা শরীর শিউরে ওঠে। দ্রুত মেয়েটির পরিচিতি এবং উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দেয় আমাকে। অবিলম্বে একে দুর করো, না হয় বিপদ হতে পারে। আমি যথাসম্ভব কঠোর কণ্ঠে মেয়েটিকে প্রশ্ন করি, এ্যাই কে তুমি? এভাবে ঘরে ঢুকে পড়লে যে?

মেয়েটি এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল সম্ভবত বসার জন্য কিছু খুঁজছে। আমার কথায় মুখ ফিরিয়ে চোখ বড় বড় করে বললো– আমারে চিনেন না, ক্যান খালাম্মা আমার কথা কয়নি আপনার কাছে খালাম্মার কাছে কত আইছি। কতো আদর করে খালাম্মা আমারে খাওন দেয়। আমি সুপিয়া!

এত বড় মেয়ের মুখে এরকম ন্যাকা ন্যাকা সুরের কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেলো। প্রচন্ড ধমকের সুরে আঙ্গুল তুলে দরজার দিকে নির্দেশ করে বলি,

–যাও এখুনি বেরিয়ে যাও। তোমাকে আমি চিনি না, চেনার দরকারও নেই। তুমি বের হও এখুনি।

–হায়..হায়.. খালুজান কয় কি?

মেয়েটি তীব্র স্বরে কেঁদে উঠে কপাল চাপড়াতে শুরু করল।

– এত রাতে আমি কই যামু, কি খামু, কই থাকুম। খালাম্মারে এট্টু ডাকেন। দুইডা কথা কই, হ্যে আমারে ফেলতে পারবনা।

– তোমার খালাম্মা বাসায় নেই। গ্রামের বাড়ী গেছেন। ফিরতে দেরী হবে।

মেয়েটির চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে,

– খালাম্মা বাসায় নেই? তয় আমার কি অইব? আমি কই যামু।

আমি নির্দয় কণ্ঠে বলি– সেটা আমার জানার বিষয় নয়, তুমি এখন যাও।

মেয়েটি হঠাৎ ধপ করে মেঝের উপর বসে পড়ে বিলাপ করতে থাকে। আমি মহা মুশকিলে পড়ে গেছি, দরজাটা তখনো আধভেজানো। খালি ঘর। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এই অবস্থায় কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে? মেয়েটির

www.pathagar.com

যা বয়স আর যে বাড়াবাড়ী রকমের সুন্দরী যে কারো পক্ষে রসালো কিছু ভেবে বসা অসম্ভব কিছু নয়। আমি মরিয়া হয়ে বলি।

–দেখো তুমি ভালয় ভালয় যাও, নয়ত নীচের দারোয়ানকে ডেকে তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করবো।

সুপিয়ার বিলাপ থেমে যায়। ভেজা চোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে বলে,

– না আমি যামু না। আপনার এত বড় বাড়ি খালি পইড়া আছে। আমি পাকের ঘরে একটু খানি জায়গায় শুইয়া থাকুম। আপনারে কোন ডিষ্টার্ব করুম না।

আহ্লাদী সুরে কথা ক'টি বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। মনে হয় এবাড়ীর সবকিছু তার পরিচিত।

–এ্যই দাঁড়াও, বলেছিই তো তোমার খালাম্মা নেই। তোমাকে জায়গা দিতে পারবোনা।

– হিঃ হিঃ হিঃ খিল খিলিয়ে হেসে ওঠে মেয়েটি। বলে,

– আপনি ডরাইতেছেন? ডরইয়েন না। আমার খালাম্মা খুব ভালো মানুষ আমারে জায়গা দিলে তিনি একটুও বকবেন না আপনারে। ওনার বড় দয়ার শরীল। আমারে সেইবার একশ'টি টাকা দিছিলো।

এতো দেখছি মহা ঝামেলা। যেতে বললেও যায়না। মেয়ে মানুষ ঘাড় ধাক্কাও দেওয়া যায়না। ঘরে দ্বিতীয় কেউ নেই যে তাকে দিয়ে ধাক্কা ধমক দেওয়াব। এসব ব্যাপারে আমি অভিজ্ঞ নই। রাগারাগি ঝুট-ঝামেলা দেখলে আমি নিজেই সরে যাই। এখন সরে গেলেও ঝামেলা সরবেনা। এখন আমি কি করি। একটু নরম গলায় বললাম,

–শোন এই বিল্ডিংয়ে এগারটি ফ্লাট আছে তার কোন একটিতে থাক গিয়ে। বলতে পারলাম না খালি বাসায় থাকা শোভন হবেনা।

সুপিয়া তার অসাধারণ সুন্দর মুখটি তুলে হাসল। সৌন্দর্য্যের সাথে আভিজাত্যের সম্পর্ক কি চিরন্তন? ওর সরল নিষ্পাপ চেহারার দিকে তাকিয়ে ওকে কিছুতেই খারাপ মেয়ে বলে ভাবতে পারছিনা। আবার ওর উপস্থিতিও অসহ্য লাগছে। সুপিয়া বলল,

– আপনি খুব বোকা। আমারে দেইখা বুঝবার পারেন না। আমারে কেউ জায়গা দিবোনা?

আমি বোকার মতই জিজ্ঞেস করি,

www.pathagar.com

– কেন, কেউ জায়গা দেবে না কেন?

সুপিয়ার মুখে বিজ্ঞের হাসি।

–আমার বয়স কম। মাত্র উনিশ আর আমি দেখতে ত ভালই তয় কথা হইল কি জানেন? ঢাকা শহরে আমার বয়সের মাইয়াগোর বড় কষ্ট। বান্ধা বাসায় কেউ রাখতে চায়না। হ্যারা মনে করে কাজের বেটি গুলান তাগো ঘরের মানুষদের চরিত্র নষ্ট করে। আসলে শিক্ষিত মানুষ গুলানই যে অশিক্ষিত মানুষের ধর্ম নষ্ট করে, রুজি রোজগারের পথ নষ্ট করে, হেইডা জাইনাও না জানার ভান কইরা গরীবের উপর দোষ চাপায়। তয় খালুজান সব মানুষ খারাপ না। কিছু কিছু ভালা মানুষ এখনো দেশটার মইধ্যে আছে। না অইলে খাওনের অভাবে, ঠাই এর অভাবে সবাইরে ফুটপাতে খাড়াইতে হইত। মাইয়া মানুষের কপাল বড় পচা। খালাম্মা আমারে কইছিলো সুপিয়া একশ'টি টাকা দিচ্ছি ভালমন্দ কিনে খাইও। তোমার পুলা অইলে দাদী নানী কাউরে দিয়া আমার বাসায় চইলা আইসো। আমি তোমারে রাখুম।

সুপিয়া চোখে আঁচল চাপা দিয়ে হু-হু করে কেঁদে ওঠে। দু'হাতে বুক চেপে ধীরে ধীরে বসে পড়ে।

–আমার দুধের বাচ্চারে জন্মের মতো ছাইড়া আইছে খালুজান। ওরে আর দেখতে পামুনা কোন দিন না... ওরে বেইচা দিছি। পেটের সন্তানরে বিক্রি করছি।...

বুক ফাটা আর্তনাদ করে সুপিয়া মেঝেয় মাথা কুটতে থাকে। আমি সভয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিই। মেয়েটির দুর্বোধ্য আচরণে আমি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছি কিন্তু ওকে সরানোর পন্থা বের করার জন্য আমার মস্তিস্কের একাংশ পূর্ণ সজাগ! দুগ্ধ পোষ্য শিশু বিক্রি করার গুজব কানে আসলেও আমি চাক্ষুষ দেখিনি। রেডিও টিভিতে উন্নয়নের গণ জোয়ার অথচ সীমাহীন অভাব অনটনে এদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষগুলোকে কোন জাহান্নামের অতলে তলিয়ে নিচ্ছে। ক্ষুধার জ্বালা জাহান্নামের অগ্নিকেও নিভাতে পারে এমনি সর্বগ্রাসী তার ক্ষমতা। হায় এর দায় ভাগ আমাকেও বইতে হবে এক দিন না একদিন। এই মুহূর্তে এসব তত্ত্বগত চিন্তা সমীচিন নয়। পুনরায় ওকে ডেকে বললাম,

–এ্যই শোন এসব মিথ্যে টিথ্যে বলে সময় নষ্ট করো না। এখনও খুব বেশী রাত হয়নি। তুমি কোথাও আশ্রয় খুঁজে নিতে পারো। আর তোমার খালাম্মা এলে তখন এসো।

www.pathagar.com

সুপিয়ার পিঠে যেন চাবুক পড়েছে। তীব্র কণ্ঠে বলে,

–আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না? আমার পুলার কথা বিশ্বাস করেন না? তয় দেখেন।

মেয়েটা আমাকে বাধা দেবার সময় না দিয়ে পট পট করে ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলে। আমি অবাক। বেদনার্ত বিস্ময় নিয়ে দেখি, নিগুঢ়তম সৌন্দর্যের আধার যে বক্ষ দুধ জমে তা দুটি শক্ত মাটির ঢেলার মতো উঁচু হয়ে আছে। রক্তাভ ফর্সা বিশাল স্তনের বোঁটা দিয়ে ফিনকি দিয়ে ছুটছে মাতৃদুগ্ধের অমিয় ধারা। আমি নিশ্চল নির্বাক তাকিয়ে। চোখ ফেরানোর ক্ষমতাও যেন আমার নেই। মুহূর্ত পরেই সুপিয়া বুক ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

– আমার খোকা আজ তিনদিন বুকের দুধ না খেয়ে আছে। ওরে আমার যাদুরে আমি যে বুকের বিষে পাগল হয়ে গেলাম রে...ও তুই কোথায় গেলিরে।

মেয়েটির কান্ডকীর্তি দেখে আমি কিংকর্তব্যবির্মূঢ় হয়ে পড়েছি। যেভাবে ভুলুণ্ঠিত হয়ে বিলাপ করছে কেউ শুনতে পেলে যাচ্ছে–তাই কান্ড হয়ে যাবে। এই ছিট গ্রস্থ মেয়েটিকে তাড়ানোর কোন উপায় বের করতে পারছিনা। অকস্মাৎ সে আমার দু'পা জড়িয়ে ধরে,

–খালুজান আপনি আমারে তাড়ায়ে দিয়েন না। আমি বাইরে গেলেই ওরা আমারে ধইরা ফেলবো। আমারে খুন করবে। কাল সকালে আমি চইলা যামু শুধু আজকার রাতটা থাকবার দেন। করুণ আর্তি ঝরে ওর কণ্ঠে মুহূর্ত আগে গ্রীক ভাস্কর্য্যের মত যে ভয়ঙ্কর সুন্দর নগ্ন মাতৃবক্ষের ছবি আমার দৃষ্টিতে চিরকালের মত অঙ্কিত হয়ে গেছে তা যেন আমার ভিতরের উপলব্ধিতে নতুন কিছু যোগ করে দিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ আগে ওই মেয়েকে বাসায় আশ্রয় দেবার কথা চিন্তায় আসলেও আমার রক্তপ্রবাহ দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। যদিও মেয়েটি খালুজান সম্বোধন করছিল। তবু সম্বোধন আমার নিষিদ্ধ অভিলাষকে উক্তত্য করতেও পারে। কারণ মেয়েটি তরুণী এবং অসম্ভব সুন্দরী। কারণ আমার বয়স মাত্র বত্রিশ। আমার বিবাহিত জীবন মাত্র কয়েক মাসের। তবে নগ্নতাও কখনো কখনো কামনার পরিবর্তে করুনা জাগায় তা ওই নগ্ন বক্ষ না দেখলে বুঝতে পারতামনা। শিকারীর তাড়া খাওয়া শাবক হারা হরিণীর মতো মেয়েটি আমার পদতলে আশ্রয় খুঁজছে। ওর চোখের পানিতে আমার পা সত্যিকার অর্থে ভিজছে। আমি মুহূর্তে ওর অভিভাবক হয়ে গেলাম। পিতার মত কিংবা বড়

www.pathagar.com

ভাইয়ের মতো জানিনা আমার বুকে হঠাৎ একটা আলোড়ন জেগে উঠল। পরম স্নেহে আমি ওর হাত ধরতে পারলাম।

– শোন, উঠে বসো। দেখি কি করতে পারি।

ওকে রান্না ঘরে বসতে বলে বড় ভাইয়ের বাসায় ফোন করি। মাকে যেন তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়। খুব বিপদে পড়েছি। মা আসলে মেয়েটিকে মায়ের জিম্মায় দিয়ে যখন শুতে আসি তখন রাত এগারটা বেজে গেছে। একটি স্বস্তি র নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ি।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানিনা। মাথার কাছে ফোন বাজতেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। দু'চোখে প্রচন্ড ঘুম। হাত নাড়তেই ইচ্ছে হচ্ছেনা তবু হাত বাড়াই।

– হ্যালো!

ওপাশ হতে উত্তর আসে

– হ্যালো রফিক, আমি আফতাব বলছি।

নাম শুনে ঘুমের রেশ কেটে যায়। পুলিশ লাইনের সিআইডি অফিসার আফতাব। আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

– কি ব্যাপার এতো রাতে?

– আমি দুঃখিত রফিক অসময়ে তোর ঘুম ভাঙ্গাতে হলো। শোন, তোর ওখানে কি একটি আঠার–উনিশ বছর বয়সের মেয়ে আশ্রয় নিয়েছে?

– হ্যাঁ–হ্যাঁ রাতে হঠাৎ মেয়েটি বাসায় ঢুকে পড়ে এমন করে আশ্রয় চাইল–না দিয়ে পারলাম না। বাসায় মিলা নেই। মাকে আনিয়ে মেয়েটিকে জায়গা দিয়েছি। She is very helpless and needy. ওর সবকথা শুনলে তোরও দয়া হতো।

না বন্ধু পুলিশের চাকুরীতে ঢুকলে ঐসব সেন্টিমেন্ট বেশীদিন থাকে না। ওই মেয়েটিকে আমরা খুঁজছি।

- Any thing wrong.

- Yes my friend সে একজন খুনী পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুজে বেড়াচ্ছে। আর একটু হলেই হাত থেকে রিসিভার পড়ে যেতো। কোনমতে বলতে পারলাম,

– এযে অবিশ্বাস্য । এও কি সম্ভব।

www.pathagar.com

– ঘাবড়াসনে পুলিশ চারিদিক হতে ঘিরে রেখেছে। ভোর পাঁচটার দিকে তোর বাসায় আসছি, বাই।

রিসিভার রেখে উঠে গিয়ে লাইট জ্বালালাম। পাঁচটা বাজতে পনের মিনিট বাকী। মাকে এখুনি জাগাতে হবে। মেয়েটিকে দেখে ওর কথা শুনে মাও ওর প্রতি নরম হয়ে পড়েছিলেন্ মা–ই খুঁজে মিলার একটি পুরনো শাড়ী ব্লাউজ দিয়ে গোছল করতে পাঠিয়েছিলেন! অতরাত্রে ভাত রেধে ওকে খাইয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছিলেন, শোয়ার আগে আমাকে বলেছিলেন,

–খোকা ওই মেয়েটির বাচ্চাকে খুজে ওর বুকে ফিরিয়ে দিস। আল্লাহ্ তোর মঙ্গল করবেন।

মায়ের কবক্তব্যের সাথে আমি একমত, আমিও ভাবছিলাম কোন মতে মেয়েটিকে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারি তাহলে হয়ত কিঞ্চিত আত্মসুখ পেতে পারতাম। কারো জন্য কিছু করতে না পারার গ্লানি হতে মুক্ত হতে পারতাম। অথচ মেয়েটি আমার ও মায়ের মহৎ অভিলাষকে কিভাবে তুচ্ছ করে দিল খুন করার মত ভয়ানক এক কান্ড বাঁধিয়ে। মিলার উপর খুব রাগ হলো। কেন মেয়েটিকে দয়া দেখাতে গিয়েছিল্ তা না হলে বাসা চিনে সে এখানে এসে পড়তো না। এখন মা–ই বা কিভাবে নেবেন! নিজের হাতে একটা খুনী মেয়েকে ভাত বেড়ে খাইয়েছেন। মা ছেলের এই দয়া দেখানোর ফলে না জানি হাজত বাসই কপালে না ঘটে।

মায়ের ঘরের দরজায় টোকা দিতে মা দরজা খুলে উদ্বিগ্ন মুখে তাকান।

– কি হয়েছে খোকা? এত সকালে উঠেছিস?

– মা ভয় পেওনা। পুলিশ বাসার সবদিক ঘিরে ফেলেছে্ ওই মেয়েটির খোঁজে।

– সেকি! কেন?

– ও খুন করেছে মা। তাই পুলিশ ওকে ধরতে আসছে।

মা আর্ত চিৎকার করে বিছানায় বসে পড়েন। মায়ের খাটের কাছে মেঝেয় চাদর পেতে হাত পা চড়িয়ে মেয়েটি অঘোরে ঘুমাচ্ছে। খুবই শান্ত নিষ্পাপ চেহারার একটি মুখ। এই মুখ খুনীর বিশ্বাস হতে চায়না। পরিষ্কার শাড়ী ব্লাউজে ভদ্রঘরের কোন মেয়ের মতই লাগছে। আমি আর মা আমরা দু'জনে অবাক হয়ে ওর ঘুমন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে খুনীর চিহ্ন খুঁজছিলাম যেন। উজ্জ্বল আলো আমাদের দৃষ্টির আঘাত কোনটাই ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিলনা। অগত্যা ডাকতে হলো।

www.pathagar.com

—এ্যাই সুপিয়া ওঠো! পুলিশ তোমাকে ধরতে এসেছে।

সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখে বোবা দৃষ্টি। কলিং বেল বেজে ওঠে। আমি দরজা খুলে দিতেই পুলিশ দ্রুত প্রবেশ করে সতর্ক চোখে এগোয়। মা খাটের উপর স্থানুর মতে বসে আছেন। পুলিশের বড় কর্তা বলেন— আমরা তাহলে ওকে এখনি নিয়ে যেতে পারি। আমি মাথা নাড়ি সুপিয়ার দিকে চেয়ে।

সুপিয়া ততক্ষণে পরিস্থিতি বুঝে ফেলেছে। সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। আশ্চর্য শান্ত স্বরে বলল,

—আপনারা আইছেন খুনের আসামী বইলা ধইরা নিতে! আপনারা কে দেখছেন খুন করতে। আমি তারে খুন না করলে হে আমারে খুন করতো। আরও অনেক মাইয়াগোরে বিয়া করনের নামে ধোঁকা দিতো, ব্যবসা করতো। নারী পাচার করতো। হে আগেও দুইটা বো'র খুন করছে। তখন ত তার বিচার করেন নাই। ক্যান মাইয়া মানুষের জান কি ফ্যালনা? তাগো খুন করলে কেউ খুনী কয়না ক্যান? হগলে জানতো হে খারাপ ছিল, অমানুষ আছিল, তার মরনে নারীর ইজ্জত বাঁচছে, গেরস্থ শান্তিতে ঘুমাইছে তবু আমারে কেউ আশ্রয় দিল না। খুনী-খুনী কইরা আমারে পাগল কইরা গ্রাম ছাড়া করলো।শহরে আইয়াও বাঁচতে পারলাম না। তয় আপনাগো বিচার আমি মানিনা। আমি অবলা মাইয়া মানুষ আমারে ধরতে সোজা। একটা কথা কই আমার বিচার করনের আগে যারা আমারে খুনী বানাইছে তাগোর বিচার করন লাগবো কইলাম।

—কথা বন্ধ করো। এই সেন্ট্রি ওর হাতে হাতকড়া লাগাও। দারোগা রেগে আদেশ দেন।

সুপিয়া আবার চেঁচিয়ে ওঠে,

—রাখেন রাখেন খালুজান আর নানীরে একটু সালাম কইরা লই। বলতে বলতে টিপ টিপ করে মা ও আমাকে সালাম করে।

— খালুজান আমারে একটা রাত আশ্রয় দিছিলেন বড়ো শান্তিতে ঘুমাইছিলাম। আল্লাহর এতবড় দুনিয়ায় আমার কোন ঠাই ছিলনা.. এই টাকাটা...

আঁচলে গিট খুলে সে একখান নোট বের করে,

—এই টাকাটা খালাম্মারে ফিরাইয়া দিবেন। আমার পোলা বেচার টাকা দিয়া খালাম্মার ঋণ শোধ কইরা গেলাম। সুপিয়া হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

www.pathagar.com

– আমার স্বামী যখন আমারে বেইচা দেওনের জন্য দরদাম ঠিক করছিল তখন সাত মাসের পোয়াতী। আমি ঢাকা শহরে আইছিলাম একশটি টাকার জন্য। মজনু কইছিল একশ টাকা দিলে আমার স্বামীকে এমন মার দেবে, এমন পিটা দেবে যে হাত পা ভেঙ্গে নুলো হয়ে থাকবে। ভাঙ্গা হাত পা নিয়ে আর কুকাম করতে পারবো না। হায় দেশে ফিরা দেখি মজনু আর নাই। ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়া গেছে। স্বামী তক্কে তক্কে ছিল আমারে মারনের জন্য। তার আগেই আমি তারে শেষ কইরা দিছি। কি ভালা করি নি? খালাম্মার টাকাটা খাইয়া শেষ করছি। হায়রে ক্ষিধে। সাত মাসে পোলা অইলো। সবাই কইছিলো এই পুলা বাঁচবোনা। এতটুকুন বাচ্চা! তার খোরাক ত আল্লাহ আমার বুকে দিছে তয় আমার খাবার কে দেবে? আমি যে খুনী! শহর আইছি খাইতে পাইনা হাঁটতে পারিনা। যেখানে যাই লোভী শকুনের চোখে আমারে ছিঁড়া খায়। শেষে পোলাটা একজনে চায়া নিল। একশটা টাকা দিল হাতে। আমার পুলারে আমি বাঁচাতে পারতামনা। ওরা কি বাঁচাবে আমার পুলারে? কন না খালুজান। টাকাটা আমার আর টাকার দরকার নাই, আশ্রয়ের দরকার নাই- আমি মুক্তি পাইছি।। টাকাটা আমার পায়ের উপর রেখে সুপিয়া উঠে দাঁড়ায়।

সেন্ট্রি ওর হাতে হাতকড়া লাগায়। অশ্রুহীন নির্বাক মুখে আমি ও মা দাঁড়িয়ে সুপিয়ার মর্মভেদী কথা শুনছিলাম। দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে সুপিয়া আবার ফিরে তাকায়।

–নানী গো আমারে মাপ কইরা দিয়েন, আমি জানি দুনিয়ার বিচারে আমার ফাঁসী হইব। কিন্তু ওই দুনিয়ায় আল্লাহও কি আমারে ফাঁসী দিবো? নানী গো আপনারা শিক্ষিত মানুষ আমার দুঃখটা বুঝবেন! জন্মে মায়ের মুখ দেখি নাই। সৎমার লাথি ঝাটা খাইয়া বড় অইছি। পেটের ভুখে ক্ষেতে জঙ্গলে ঘুইরা বেড়াইছি। পরের ঘরে কাম করছি। এক বেলাও পেট ভরে খেতে পাইনি। বড় গরীব গাঁও আমাদের। শুধু দু'মুঠো ভাতের লাইগা ওই হারামীরে বিয়া করছিলাম। হেও বেঈমানী করলো। আমারে বেইচা দিতে চাইলো। স্বামী থাইকাও যার ইজ্জত নষ্ট হয়, স্বামী গা করে না, হে স্বামীরে মাইরা আমি অপরাধ করছি? আমার পুলাটারে নিজের কাছে রাখতে পারলামনা। ক্ষুধার জ্বালায় বেইচা দিলাম। নানী গো আমার কোন আফসোস নাই। যতোদিন বিচার না অয় জেলের ভাত খামু আর বিচার শেষে ফাঁসীতে যামু। এই জেবনডার কোন মূল্য নাইগো নানী। খালি দোয়া কইরেন। অই দুনিয়াতে

www.pathagar.com

যেন আমার পুলাটারে বুকের দুধ খা্ওয়াইয়া বুকের মধ্যে ধইরা রাখতে পারি। আমার বুকটা জানি জুড়ায়।

মা সুপিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

– আল্লাহ তোমাকে শান্তি দিন ।

সুপিয়া ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে লাইট নিভাতে এক ঝলক ভোরের আলো ঘরে প্রবেশ করে।

ঝাপসা শীতল আলোয় দেখি একশত টাকার নোট খানি মাটিতে পড়ে আছে সুপিয়ার অস্তিত্ব মেখে।

www.pathagar.com

জনম জনম ধরে

মাঘের প্রায় শেষ। শীত বলতে গেলে নেই বললেই চলে। এই বছর শীত তেমন পড়েনি। পড়েনি বলে রাহাতুনদের এ বছরের শীতটা মোটামুটি ভালই কেটেছে। তবু পৌষ সংক্রান্তির সময় দু-একদিন সেকি বেজায় শীত পড়েছিল। দু-তিনটে কাঁথা গায়ে চাপিয়েও শীতকে ঠেলে সরিয়ে রাখতে পারেনি। শেষমেষ চেরাগ জ্বালিয়ে রাত ভোর করেছিল।

শেষ রাতে কী এক স্বপ্ন দেখে রাহাতুনের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। ভাঙ্গা ঘুমটা জোড়া দেওয়ার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় সে। ঘরের এককোণে রাত মোরগটা গা ঝাড়া মেরে বাগ দিয়ে ওঠে। গুনে গুনে তিনটে বাগ দিয়েছে। তার মানে ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। শত ছিদ্র বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভোরের হিম হিম বাতাস ঠান্ডা ছড়াচ্ছে। রাহাতুন কাঁথাটা ছেলে মেয়েদের গায়ে ভাল করে জড়িয়ে দেয়। আবুলের পাটা বার বার কাঁথার তলা হতে বেরিয়ে আসছে। ওকে কাছে টেনে পাটা ভিতরে ভাল করে ঢুকিয়ে দিতে দিতে ভাবল আবুলটা বাপের চেহারাই পাইছে মনে হয়। তেমনি ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা হাত পা। কালো, রুক্ষ চেহারা। এই বয়সেই কেমন ভাঙা ভাঙা দেখায় ছেলেটা । আহারে উঠতি বয়সের পোলা,পেট ভইরা খাওনইত দিতে পারে না রাহাতুন-গায়ে গতরে মাংস লাগবে কেমন করে ! বাপ থাকলে কত যত্ন-আত্তি পাইত। রাহাতুনের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। কই যে পালাল লোকটা! ক্যান পালাল কোনদিন জানতে পারবেনা রাহাতুন। এক যুগেরও বেশী হয়ে গেল। রাহাতুন প্রথম স্বামীর চেহারা ভাল করে মনেই করতে পারছেন না। খুব লম্বা মতন। কালো ঠোটের উপর তাগড়া মোচ । একমাথা বাবরী চুল.....আর.... আরকি...।

সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে। স্বামীকে খুব ভয় ভক্তি করত। লজ্জাটা একটু বেশী ছিল। দিনের বেলায় স্বামীর মুখের দিকে ভাল করে চেয়েও দেখেনি। ওকে দেখলে বুকের ভিতর কিযে গুরগুর করে উঠত! স্বামীর পায়ের শব্দ, লাল গামছার একটুখানি ঝলক কিংবা দূর থেকে একঝলক দেখা ওতেই লজ্জিত

www.pathagar.com

হয়ে তাড়াতাড়ি মুখে ঘোমটা টেনে দিত। সারাদিন লোকটা টাকা পয়সার ধান্ধায় থাকত। কোন কোন দিন রাতেও দেরি করে ফিরত। ফিরত যখন দুহাত ভরে বাজার নিয়ে ফিরত। এত বাজার। রাহাতুন অবাক হয়ে যেত। দুজন মানুষের জন্য এত বাজার দিয়ে কি হবে।

–খা.. খা ভাল. করে জানটা ভইরা খা... আল্লাহর দুনিয়ায় সবদিন সমান যায়না রে। যে দিন যেমুন পাবি সেইদিন তেমুন খাবি। কপালে উপোস থাকলে উপোস, রাজভোগ থাকলে রাজভোগ।

রাহাতুন ভীরু কণ্ঠে ঘোমটার আড়াল হতে বলত,

– কিছু মাছ জ্বাল দিয়ে রাখি?

–আরে না.. না! সব রান্না কর। ভাল করে রান্না করে প্রতিবেশীদের ঘরে এট্টু এট্টু দিয়ে আয়। আমার বাপজান বলতো প্রতিবেশীদের ঘরে মাঝে মাঝে খানা পাঠাইবা, খোজ খবর লইবা। এইডা হইল গিয়ে রসূলের মুখের কথা হাদীস। বুঝলানি?

রাহাতুন নীরবে ঘাড় নেড়েছে। পরিপাটি করে রান্না করে স্বামীকে খাইয়েছে। প্রতিবেশীর ঘরে দিয়ে এসেছে। খাওয়া শেষে পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে পান মুখে দিতে দিতে রহস্যময় কণ্ঠে বলেছে স্বামী।

– তুমি বড় ভালা রান্ধ। বড় সোয়াদ তোমার হাতের রান্ধায়। আমি ভাদাইম্যা মানুষ। এক জায়গায় বেশীদিন থাকবার পারিনা। তুমি খানা খাওয়াইয়া আমাদের বাইন্ধা ফেলছো।

রাহাতুন লজ্জায় লাল হয়। জবাব খুঁজে পায়না সে। মনে মনে ঠিক করে আরও ভাল রাঁধবে সে। সেবাযত্ন করে মানুষটারে থিত কইরা ছাড়বে। সবাই বলে রহিম পুলাটার মনটা বড় ভালা তয় বড়ই অস্থির মতি। এক জায়গায় এক কামে বেশী দিন থাকেনা সে।

যার যেমন স্বভাব! রাহাতুন কি করে বদলাবে? পনর বছরের একটি পুঁচকে মেয়ের বাহুর জোর কতটুকু? চিরদিনের ভাদাইম্যা স্বভাবের রহিম সাত মাসের পোয়াতী রাহতুনকে ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন।

www.pathagar.com

রাহাতুন মাসের পর মাস অপেক্ষা করে। তার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায়না রহিম স্বেচ্ছায় চলে গেছে। অত আদর অত টান ফেলে কি করে পালাল সে? রাহাতুন কি দোষ করেছিল? অনাদরে অবহেলায় আবুলের জন্ম হয়। তবু মা তখন বেঁচেছিল। কোন মতে সঞ্চিত তলানিটুকু নিয়ে ক'টা মাস কাটিয়েছে।

বছর ঘুরে এল। স্বামী ফিরেনা রাহাতুন বাড়ীবাড়ী কাজ নেয়। আবুলকে বাঁচাতে হবে। নিজেকেও। তাই ত বছর চারেক না যেতে আবার নিকাহ বসেছে রশীদ ড্রাইভারের সাথে। রাহাতুনের শক্ত সমর্থ শরীর মায়াময় মুখশ্রী রশীদ ড্রাইভারকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। একটা মেয়ের জন্ম দিয়ে দু'বছরের মাথায় রাহাতুনকে তালাক দেয়। স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল সে। সেত সেবা যত্নে কাজে কর্মে কোন ত্রুটি করে নি। তবু কেন তালাক নিতে হলো। কারণ খুঁজতে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় নি। রশীদ তৃতীয় স্ত্রী ঘরে তুলেছে তিন দিন না যেতেই।

পাঁচ বছরের আবুল এক বছরের সোনাভানকে নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখে রাহাতন। আর তখনি হেল্পার জালালের সাহায্যের হাত নেমে আসে। লালসা ও কামনা মাখা হাত না ধরে রাহাতুনের উপায় কি ছিল? পেটের দায়ে ইজ্জত এমনিতে বিকোতে হতো কিন্তু কেমন করে মা চাচীদের কথা স্মরণ হয়েছিল রাহাতুনের। ব্যভিচারীর মাপ নাই? হায়রে ব্যভিচার? রাহাতুনের ইচ্ছার কি মূল্য! রাহাতুন কি নিজের ইচ্ছায় ব্যাভিচার করে? পেটের দুরন্ত ক্ষিদের কাছে নিষেধাজ্ঞা খড়কুটোর মত ভেসে যায়। রাহাতুনের মনে হয় যেদিন থেকে ওদের মত মানুষেরা ভিটে মাটি ঘর হতে উচ্ছেদ হয়ে বস্তিতে ঠাঁই নিয়েছে সেদিন হতে হায়া,শরম, মান-ইজ্জত সব খোয়া গেছে। ওরা আর সে সব ফিরে পাবে না। ঘাটে ঘাটে যেমন বাণিজ্যের নৌকো ভিড়ে ওরাও তেমনি এক বস্তি হতে আরেক বস্তি, এক স্বামী হতে আরেক স্বামীর দুয়ারে দুয়ারে আশ্রয় খুঁজবে। তাও যতদিন যৌবন আছে, রূপশ্রী আছে-শুধু ততদিন।

ওদের কেউ কেউ স্বামীর নামই মুখে আনতে চায়না। ওরা, ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বলে সোয়ামীর ঘরে একমুঠো ভাতের সাথে বিস্তর লাথি ঝাটা খাইতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই সে কি মার! তার চাইতে এই বেশ। দশ-বিশ, মন চাইলে উপরি রোজগার করতে পারি। কেউ বাগড়া দিতে আসেনা।

www.pathagar.com

না..না.. রাহাতুন অত নীচে নামতে পারেনা। মা বলতো এককালে ওদেরও জোত জমি ছিল। লোকজন ওর দাদাকে মান্যগণ্য করতো। বাড়ীতে বছরে দু'একবার ওয়াজ মাহ্‌ফিল বসতো। গ্রামের লোকজন দূর দুরান্ত হতে আসা মৌলানাদের মুখ হতে আল্লাহ্‌-রসূলের, হাদীস-কোরানের কথা শুনতো। রাহাতুন সে সব দিন দেখেনি। ও ত দেখেনি নবান্নের সময় কেমন ঘন দুধ আর আখের গুড় দিয়ে ওদের বাড়ীতে শিরনী হতো। গ্রামের মানুষ জন তৃপ্তি নিয়ে খেতো? কেন যে সে সব দিন এমনি করে মিলিয়ে গেল। কেন ওর কাছে রূপকথার গল্প হয়ে গেল বুঝতে পারে না।

চোখের পানি মুছতে মুছতে জলিল হেল্লারকে বিয়ে করে। সমস্ত শরীর মন জুড়ে তীব্র অনিচ্ছা নিয়ে সে বিয়েতে রাজী হয়েছিল। জলিল ছিল মিট মিটে শয়তান। তার বিরূপতা বুঝে নিতে তার দেরী হয়নি। নতুনত্বের ঘোর কাটতেই তার ভিতরের কুৎসিৎ চেহারা বের হয়ে পড়েছিল। কথায় কথায় মার আর অশ্লীল গালাগাল। তবু রাহাতুন মুখ বুজে সহ্য করতে চেয়েছিল। বিয়েটা ভাঙুক এটা সে চায়নি। একটি পুরুষ মানুষের ছায়ায় তার ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠুক, নিজের শরীর লোলুপ দৃষ্টির আগুন হতে বাচুঁক-তাই সে চেয়েছিল।

রাহাতুনের ভাঙা কপাল! বিয়ের সুখ কপালে নিয়ে তার জন্ম হয়নি। কোলে সন্তান আসতে না আসতেই জলিল তাকে ছেড়ে কোথায় যে গেল তার হদিশ সে আর পায়নি। ক'টা দিন অপেক্ষার পর সে নিজের মনকে কঠোর করে তুলেছে। ঠিক করেছে এবার সে-ই তালাক দেবে। ওই লোকের ঘর সে আর করবেনা। কিন্তু ঘরে দানা পানি নেই। তিনটে অবোধ সন্তান। ছোটটির বয়স চল্লিশদিনও পুরোয়নি কি করে চলবে তার। ধার দেনা করে দিন দশেক কোনমতে চলার পর সে আবার কাজ নিয়েছে বাসা বাড়ীতে। কোলে ছেলেটিকে পুষ্যি দিয়েছে এক বড়লোক গিন্নীকে। মাঝে মধ্যে তিনি সাহায্য করতেন তারপর একদিন হঠাৎ করে কোথায় যে বাসা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, রাহাতুন আজও তার খোঁজ পায়নি। ওর বুকের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে। দেড়মাস বয়সের সন্তানের এক রত্তি তুলতুলে মুখটার জন্য।

-খোদা! যেহানে থাকুক সুখে থাকুক, বাইচা থাকুক। ঝরঝর করে চোখের পানি ঝরে রাহাতুনের।

www.pathagar.com

– মাগো শীত করছে একটু বুকে নাওনা। ছেলেটা ঘুম জড়ানো গলায় ডাকে।

– সকাল হয়া গেছে বাপ। এবার ওঠো..মুখ ধুইয়া চাট্টি পান্তা খেয়ে

বস্তাটা নিয়া যাও কাগজ টুকাইয়া আনোগা।

রাহাতুন চোখের পানি মুছে উঠে পড়ে। বদনায় রাখা পানিটা নিয়ে অজু করে নামাজটা সেরে নেয়। মুরগীটারে দানাপানি দিয়ে বাইরে ছেড়ে দেয়। বাচ্চা দুটোর জন্য পান্তা বেড়ে আর একবার তাগাদা দিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাড়ায়। দালান কোঠার উপর দিয়ে সূর্য উঁকি মারছে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় একই রকম ভেজা স্যাতস্যাতে নর্দমা বহুল এই এলাকা। রাহাতুন নাকে আঁচল দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে। জায়গায় জায়গায় আবর্জনার সাথে সদ্য ছেড়ে যাওয়া পায়খানার দুর্গন্ধময় উপস্থিতি। রাহাতুন ভাবে আর একটা বাসা জুটিয়ে নিতে পারলে সে এই বস্তি ছেড়ে দেবে। সে দ্রুত পা চালিয়ে কাজের বাড়ীর উদ্দেশ্যে পা চালায়।

গলির মোড়ে মুদীর দোকান। পাশে লাইটপোষ্ট। লাইটপোষ্টে ঠেস দিয়ে সেদিনের সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। কদিন ধরে কাজে যাবার পথে লোকটাকে দেখছে রাহাতুন। তেমন গা করেনি। গতকাল ফুলির মার কথায় খেয়াল হয়। আরে তাইত লোকটা ড্যাব ড্যাব চোখে তাকেই দেখছে মনে হলো। ব্যাপার কি? কি দ্যাখে! তারে দেখনের কি আছে? রোদে শোকে তাপে দারিদ্র্যে জর্জরিত যে তার মধ্যে দেখনের কি বাকী থাকে? শুষ্ক বিবর্ণ চুলের গোছা মাথায়। অর্ধাহারে অনাহারে গাল বসে যাওয়া, এককালের ফর্সা ও পুড়ে তামাটে হয়ে যাওয়া মেয়েলোকের মধ্যে এখনো পুরুষকে আকর্ষণ করার মতো কিছু কি অবশিষ্ট আছে? বিন..বিন করে এক ধরনের রাগ উঠে আসে শরীরে। পুরুষ জাতটার চোখের দিকে আজকাল তাকানোই ছেড়ে দিয়েছিল সে। আজ সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

– কি চান আপনে? রোজ রোজ পথ আগলে খাড়াইয়া থাকেন কিয়ের লাইগা?

– আমি তুমারে দেখনের লাইগা খাড়াই। এক মুখ দাড়ি জঙ্গলের ভিতর লোকটার সাদা দাঁতের হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বোঁ করে রাগটা মাথায় চড়ে

www.pathagar.com

বসে। দ্রুত ডান হাতটা লোকটার মুখের কাছে না পৌঁছুতেই লোকটা হাত ধরে ফেলে।

– রাগ করেন কেন? আমি দূরের মানুষ না আপনারই আপনজন। ভাল কইরা চাইয়া দেহেন। লোকটার মুখে মিটি মিটি হাসি।

রাহাতুনের হাতটা তখনো অই লোকের হাতের ভিতর। টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় লোকটার দিকে। ঈষৎ লালচে রুক্ষ ময়লা চুল। বিরাট কপাল। মস্তবড় গোঁফ দাড়ি, কালো লম্বা আধবয়সী লোকটাকে কখনো দেখেছে বলে মনে পড়েনা।

–না আপনি আমার কেউ না, কোন দিন বাপের জন্মে দেখেছি বলে মনে পড়েনা। রোজ রোজ এই খানে খাড়াইবেন না। আমার অসুবিধা হয়। পথ ছাড়েন।

রাহাতুন ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরাতে লজ্জা কিংবা ভয় কোনটাই অনুভব করেনা। শুধু সে তার রক্তে তীব্র ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ অনুভব করে। ঘৃণা! তার অন্তর জুড়ে অপার ঘৃণা পুরুষ জাতটার উপর। সে আর কখনো পুরুষের ছলনায় ভুলবে না। খেতে না পেয়ে মরতে বসলেও না। সে দ্রুত পা চালায়।

এর পর দু'দিন লোকটাকে দেখে নি। তৃতীয়দিন আবার সন্ধ্যা বেলা গলির মুখে দেখা। এবার নিজে যেচে কথা কয়,

–এই শোন তোমার সাথে একটু কথা কইবার পারি?

– কথা, কিসের কথা?

–তোমার বর্তমান সোয়ামীর নামডা কি?

– তা দিয়া আপনার কি কাম? আপনারে আমি চিনিনা– আপনার সাথে কোন কথা নাই আমার।

–রাগেন কেন। আগে ত আপনারে কোন দিন রাগতে দেহি নাই। কথায় কথায় এমন ঝাঁঝ ক্যান। লোকটার মুখে মায়াবী হাসি।

রাহাতুনের রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। সারাদিন পরের ঘরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে দিন কাটে। ভাল মন্দ দু'টি কথা বলার সাহস দেখাতে পারেনা । কত

www.pathagar.com

অন্যায় কথা, অন্যায় ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। ঘরে ফেরার পথে সেগুলো মনে হলে পরের দিন আর কাজে যাওয়ার ইচ্ছাই হয়না। এমনি ক্রোধ চাপতে চাপতে ওরা যখন ঘরে ফেরে নিজেদের মধ্যে তখন আর রাখ ঢাক থাকেনা। যার যা মনে আসে মুখ উগরে দেয়। মধুর কথা, মধুর ব্যবহার কেমন করে করবে তারা? আর এই লোকটাকে ত একটা মধুলোভী ভ্রমর ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেনা রাহাতুন। আর নয়। পুরুষের ভাত ছিটিয়ে কাক ডাকার খপ্পরে সে আর পড়বেনা। তার শরীরকে আর পুরুষের হাতে তুলে দেবেনা সে। সে ঘর চেয়েছিল, স্বামী-সন্তান চেয়েছিল, তার সারা জনমের সাধ একটি মাত্র স্বামীর পায়ের তলায় জীবনটা কাটিয়ে যাওয়ার। তা ত হয় নাই। সন্তানের মুখের মায়া ঠেলে যে পিতারা নিরুদ্দেশ হয় তারা কি মানুষ? দাদী বলত সন্তান হলো মুহব্বতের শিকল। বেয়াড়া পুরুষকে সন্তানের মায়া দিয়ে ভুলাতে হয়। সন্তানের মায়া বড় মায়া। বড় শিকল। কই সে ত তিন তিনটি স্বামীকে চেয়েছে ভালাবাসা দিয়ে, সন্তান দিয়ে বেঁধে রাখতে পারেনি। ওরা বার বার শিকল ছিড়েছে আর রাহাতুনকে করেছে নিরাশ্রয় ও অসহায়। একটু একটু করে চিবিয়ে খেয়ে ছোবড়া করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে ওদের তৃপ্তি। সন্তান আসছে শুনলে ওদের চোখের নেশা কেটে যায় তখন কেবলই পালাবার পথ খোঁজে।

কতক্ষণ চুপ করে ছিল জানেনা সম্বিত ফিরে পেয়ে স্থির হয়ে বলে।

– আজে বাজে কথার প্যাচাল পাড়েন ক্যান। কি কইবেন খুলাসা কইরা কন?

–খুলাসা কইরা কইবার জন্যই ত আইছি। সাহস দাও তা কই।

–কন।

পনের বছর আগে করিম ব্যাপারীর পোলা রহিম ব্যাপারীর সাথে তোমার শাদী হইছিল, মনে আছে? তোমার বয়স তখন চৌদ্দ পনর বছর হইব মনে হয়।

রাহাতুন বিস্ময় বিমুঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে।স্মৃতির অতলে হাতড়ে ফিরে স্বপ্ন দেখা সেই লোকের আবছা স্মৃতি! লোকটা এগিয়ে আসে! শক্ত হাত রাখে রাহাতুনের কাঁধে।

www.pathagar.com

– আমি সেই রহিম ব্যাপারী..চিনবার পারছ! রাহাতুনের মুখের কাছে সেই লোকের ফিস ফিস কণ্ঠ। দু'কাঁধে শক্ত ভারী হাতের চাপ। সেই ঘোরলাগ স্পর্শ।

–আমি সেই রহিম ব্যাপারী।

রাহাতুনের দেহটা অবশ হয়ে আসছিল। তার কোথাও যেন এতটুকু শক্তি নেই। কিশোরী বয়সের প্রথম বিবাহ রাত্রি... মেহেদী আর সুগন্ধি তেলের মৌ মৌ গন্ধ ভরা দিন রাত্রি বহু দুরের ওপার হতে যেন রাহাতুনের নাকে এসে লাগে। চেহারা মনে নেই কিন্তু তার সেই পাগল করা হাতের স্পর্শ এখনো বেঁচে রয়েছে প্রতিলোমকুপের শিরায় শিরায় জাগ্রত হয়ে। যাকে এতটুকু মলিন করতে পারেনি দু'জন স্বামী।

–এই সেই!!!

রাহাতুন চোখ বুজে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। স্থলিত গলায় বলে,

–কিয়ের লাইগা আইছেন? পনের বছর আগে যারে অসহায় কইরা থুইয়া গেছিলেন, সেকি বইসা আছে আপনার লাইগা? কি মনে করেন, আপনি যান চইলা যান। আপনার মুখ আমি দেখবার চাইনা।

রাহাতুন হঠাৎ ছুটতে থাকে। করিম ব্যাপারী প্রথম ভড়কে যায়। পরে সেও পা চালিয়ে রাহাতুনকে ধরে ফেলে।

–আমাকে মাপ কইরা দাও রাহাতুন। আমি অন্যায় করছিলাম। আমারে ক্ষমা করো আমার এখন কেউ নাই। বৌ নাই–পোলা নাই, কেউ নাই্ আমারে তুমার কাছে ঠাঁই দাও, রাহাতুন। রাহাতুনের দুহাত ওই লোকের মুঠোর ভিতর।

–আপনার পুলা পাইবেন আমারে কিয়ের দরকার।

– রাহাতুন কত জায়গায় ঘুরলাম কত জনার রান্ধা খাইলাম। তোমার কাছে যে শান্তি, তোমার হাতের রান্নার যে সোয়াদ তা আর কারো কাছে পাইলাম না রাহাতুন। তোমার অভিশাপ আছে আমার উপর। আমার দুইটা বৌ মরছে, পুলা মরছে, এখন আমার কেউ নাই। আমার শেষ কালটা তোমার কাছে কাটাইতে চাই। আমারে ঠাই দাও রাহাতুন্ তোমারে নিয়ে আমি দেশে যামু। দেশে নতুন চর জাগছে। আমাগো জমি জমা আবার ফেরত পামু। তোমারে নিয়া নতুন কইরা ঘর বান্ধুম। তুমি রাজী হও।

www.pathagar.com

অতবড় মানুষটা যেন এখনি রাহাতুনের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কামনা নয়, লালসা নয়, করুণ মিনতি ওই লোকের চোখে। রাহাতুন কি করে ফেরাবে? সে সাধ্য কোথায় তার।

পদ্মা পারের মানুষ রাহাতুন। নদী বারে বারে স্বর্বস্ব কেড়ে নিলেও বেঁচে যাওয়া মানুষেরা বারে বারে মাথা সোজা করে উঠে দাঁড়ায়, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে শামিল হয়। আবার ঘর বাঁধে । রাহাতুনও কি শেষ চেষ্টা করে দেখবে একবার? জনম জনমের সাধ তার একটি ছোট্ট ঘর, ছোট্ট সংসার মনের মতো স্বামী–সে সাধ কি পূর্ণ হবে?

রহিম ব্যাপারীর হাতের উপর রাহাতুনের চোখের কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ে।

www.pathagar.com

অচেনা সুখ

ঘর প্রায় অন্ধকার। টিম টিম করে একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেনের মৃদু লালচে আলোয় ঘরের আসবাবপত্র অস্পষ্ট কালো ভূতুড়ে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু আগে বিদ্যুৎ চলে গেছে। তাই হ্যারিকেন জ্বালানো। বাইরে ঝড়ো বাতাস প্রবল বেগে বইছে। সঙ্গে মুষল ধারায় বৃষ্টি। ঘরের বন্ধ দরজা জানালায় ঝড়ো হাওয়া আছড়ে পড়ছে শোঁ..শোঁ গর্জন তুলে থেকে থেকে ধাতব কোন কিছুর আওয়াজ আসছে। কোথাও কোন দরজা খুলে গেছে হয়ত। সম্ভবত ছাদের সিঁড়ি ঘরের টিনের দরজাটা কেউ খুলে রেখেছে ভুলে। তারই আওয়াজ অশরীরি আত্মার পদাঘাতের মতো কানে বাজছে। প্রকৃতির এই রুদ্র ভয়াল মূর্তি দেখে পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে আরও ভয়ংকর কিছুর অপেক্ষায় আছে।

এই ছোট্ট প্রায় অন্ধকার ঘরের ভিতরও দুর্যোগ যেন ছায়া ফেলেছে। শেষ অক্টোবরের আসন্ন সন্ধ্যায় সচরাচর এমন বৃষ্টি হয় না। আজ হচ্ছে। আজকের সব কিছুই অন্যরকম মনে হচ্ছে শফিকের কাছে। অফিস থেকে ফেরার সময় যখন বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল তখনই একটা কাক তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় মলত্যাগ করে। একেবারে বাঁ কাধের উপর। বিরক্তিতে ঘেন্নায় মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। কাকের বিষ্ঠা নিয়ে আর বাসের জন্য অপেক্ষা না করে দশ দশটি টাকা গচ্চা দিয়ে রিকশায় বাসায় ফেরে। তখনই তার মনে একটা অশুভ ছায়া পড়েছিলো।

আজকের ঝগড়াটা অশুভ মনে হচ্ছে। মিলিকে ঠান্ডা করা যাচ্ছেনা কিছুতেই। মিলির পরনে লাল নকশী পাড়ের কালো রঙের টাঙ্গাইল শাড়ী। আবছা আলোয় শরীরের অবয়ব অস্পষ্ট। শুধু ফর্সা মুখ, হাত, গলা অন্ধকারে সন্ধ্যামালতীর মত ফুটে আছে। মিলির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভীষণ তীব্র হয়ে আঘাত করছে শফিকের শ্রবণেন্দ্রিয়কে। অবশেষে শফিক নিরুপায় হয়ে প্রশ্ন করে,

www.pathagar.com

–তাহলে তোমার কথাই ঠিক থাকবে? আমার কথার কোন মূল্য নেই তোমার কাছে?

– আমারও ত একই প্রশ্ন তোমার কাছে।

–চিরদিন শুধু তোমার কথাই শুনে এসেছি, একদিনের জন্যও কি আমার কথা রাখতে পারো না? মিলির কান্না ভেজা উত্তর।

–দেখো মিলি, তর্কের খাতিরে তর্ক করলে কোন দিনই তর্ক শেষ হবে না। আসল কথায় এসো...সব বাদ দাও, শুধু একটি কথার জবাব দাও। তুমি কি আমার সংসার করতে চাওনা?

মিলি তীব্র চোখে তাকায়-কেন চাইবোনা? একশোবার চাই, কিন্তু তোমাকে আমি এই কথাটি বুঝাতে পারছিনা...সংসার করা মানে শুধু দুটি মানুষের পাশাপাশি বাস করা নয়। শুধু মাত্র হুকুম করা, হুকুম তামিল করা নয়। আরও অনেক কিছু...।

শফিক রেগে যায়,

–তার মানে তুমি বলতে চাইছ আমি তোমাকে কিছুই দিইনি, আমি শুধু তোমাকে হুকুম করি আর কিছুই নয়? তুমি আমার ক্রীতদাসী?

মিলির মুখে বক্র হাসি ঝলসে উঠে–ঠিক তাই। যে কথা বলতে আমার মুখে আটকাচ্ছিল তুমি তা বলে দিয়ে সহজ করে দিলে। বিয়ের পর হতে তোমার মনের মতো হওয়ার জন্য আমাকে কত কিই না শেখালে কিন্তু আমার ত মন বলে একটা জিনিস আছে। আমিও তো মনের মতো কাউকে চাই। কই তুমিতো কোন দিন আমার মনের মত হতে চাইলে না? আমারও ত ইচ্ছে–অনিচ্ছে পছন্দ–অপছন্দ থাকতে পারে?

শফিক বিস্ময়ের সুরে বলে–মেয়েদের আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে কি? স্বামী যেভাবে চালাবে মেয়েদের সেভাবে চলতে হয়।

মিলি ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে।–উপযুক্ত হৃদয়বান স্বামীর কথায় চলতে কোন মেয়েই অমত করেনা। কিন্তু যে স্বামী শুধু নিজের চাহিদা নিজের প্রয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায়, সেখানে একজন মেয়ে কি করে খাপ খাওয়াবে বলতে পারো? আমিও ত একজন মানুষ? আমারও স্বপ্ন আছে,

www.pathagar.com

কল্পনা আছে যার কোন দাম নেই তোমার কাছে। শুরু থেকে তোমার ইচ্ছে মতো সব কিছু চলে এসেছে। আমি কিছু বলতে চাইলে তুমি এড়িয়ে গেছো। আমিও ঝগড়া এড়ানোর জন্য চুপ থেকেছি, কিন্তু আর কতদিন? ... আর কতদিন এভাবে চলতে পারে...। বলতে পারো?

মিলি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুফিয়ে ওঠে,

–আমি এভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরতে চাইনা। এভাবে একজনের অন্যায় ইচ্ছের কারাগারে বন্দী হয়ে তিলে তিলে নিঃশেষ হতে চাইনা। আমি চলে যাবো... আমাকে যেতে দাও। মিলি জলভরা চোখ তুলে শফিকের মুখের দিকে তাকায়।

শফিক থমথমে ভাব নিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক দিন কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে অমন জলেভেজা মুখ স্তব্ধ করে দিতে পেরেছে। কতদিন অভিযোগ করা কাতর কণ্ঠকে পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আজ ওই মুখে কিসের যেন দ্যুতি চমকাচ্ছে, যাকে উপেক্ষা করা যায়না। ধমক ত নয়ই। শফিকের ভেতরটা অজানা আশংকায় শিউরে ওঠে,

–মিলি আজ এমন অবুঝের মতো কথা বলছে কেন?

মেয়েদের কান্না নাকি কোনদিনও তার মনস্পর্শ করে না। নববধূ থাকতেই সে মিলিকে কড়া ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছিল প্যানপ্যানানি পছন্দ করেনা সে। সব সময় মেয়েদের দাও.. দাও স্বভাব সে একটুও সহ্য করতে পারেনা। মিলি কথা রেখেছে। কোনদিন কিছু চায়নি।....কিন্তু আজ হঠাৎ রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করলো কেন? শফিক কি আত্মসর্মপন করবে? না..না..ছিঃ! তা সম্ভব নয়। সহজ মনের চারপাশে যে কাঠিন্যের দেয়াল একটু একটু করে গড়ে উঠেছে তা কি করে ভাঙ্গা যায়? শফিক বিচলিত বোধ করে। মিলিকে কিভাবে শান্ত করা যায়?

বাইরে বর্ষণ আরও প্রবলতর হয়ে উঠেছে। এই ঘোর অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে একাকী চলে যাওয়ার জন্য মিলি তৈরী। শফিকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ক্রোধে ভয়ে শফিক একেবারে যেন বোবা হয়ে গেছে। দশ বছরের বিবাহিত জীবনকে তুচ্ছ করে মিলি স্যুটকেস হাতে দরজার ছিটকিনি খুলতে যায়।

www.pathagar.com

শফিক তীব্র স্বরে মিলিকে বাধা দিতে যায় কিন্তু কি আশ্চর্য তার গলায় কোন শব্দ হয়না। সকল শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। তার অন্তরাত্মা নিঃশব্দে চিৎকার করে বলছে–মিলি যেওনা, এভাবে যাওয়া ঠিক নয়।

মিলিকে বাধা দেওয়া উচিত, ফেরানো উচিত। শফিক এখন কি করবে? সে তার গলা দুহাতে খামচাতে লাগল। তার অসহায় আহত পশুর মত অক্ষম গোঙানো মিলি দেখতে পায়না। সে ততক্ষণে ছিটকিনি খুলে ফেলেছে আর তখনি প্রাণান্ত চেষ্টায় শফিক চিৎকার করে ওঠে,

– না... না.. মিলি যেওনা।

নিজের গলার চিৎকারে শফিকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে ধড়মড় করে উঠে বসে। গলার উপর ভারী ম্যাগাজিনটা পড়েছিল। সেটা সরিয়ে একপাশে রেখে দেয়। সে ভীষণ অবাক হয়ে চারদিকে তাকায়। এখন দিন না রাত্রি! মুহূর্তের জন্য মনে করতে পারে না। হাত বাড়িয়ে ঘড়ি দেখে। বিকেল পাঁচটা। দুপুরের রোদ সরে গিয়ে বিকেলের স্বর্ণাভা ফুটে উঠেছে জানালার কাচে। শেষ বিকেলের একটুকরো রোদ ঘরে এসে পড়েছে তীর্যক ভঙ্গিতে।

শফিক তাহলে এতক্ষণ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল? ওহ কি সাংঘাতিক। এমন বাস্ত ব মনে হচ্ছিল স্বপ্নটা। কি ভয়ংকর! এমন শ্বাস রুদ্ধকর স্বপ্নও মানুষ দেখে? খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ এ নিছক স্বপ্নই সত্যি নয়।

শফিক স্বপ্নের ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবতে বসে।

দুপুরের খাবার খেয়ে বিছানায় যাওয়ার সময় ম্যাগাজিন হাতে করে শুয়ে পড়েছিল। একটা গল্প পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। শফিক ভাবে অবচেতন মনে হয়ত গল্পের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা কি করে হয়? সেতো রোমান্টিক প্রেমের গল্প পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নটা ছিল একবারে ভাঙনের। স্বপ্নটা শফিককে দারুণভাবে নাড়া দেয়। তারা কি তাহলে প্রেমের বিপরীত মেরুতে বসবাস করছে। মিলির মনেও কি এসব ভাবনা কোনদিন ছায়াপাত করেছে?

www.pathagar.com

শফিক বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।মিলি ঘরে নেই। বাচ্চা দুটো হয়ত বাইরে মাঠে খেলছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দেখে। ঠিক তাই। সে কিছুক্ষণ পায়চারী করে। তারপর মিলিকে ডাক দেয়।

– মিলি.. মিলি।

মিলির সাড়া নেই। রান্নাঘরে এসে দেখে চুলায় চায়ের কেটলী চাপিয়ে মিলি জানালা ধরে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শফিকের উপস্থিতি টের পায়না। ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম ছ'টা মিলির মুখে যেন আবির মাখিয়ে দিয়েছে। দিগন্তের কাছাকাছি একঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। মিলির দৃষ্টি যেন সে সবকে ছাড়িয়ে দূরে আরও বহুদূরে চলে গেছে। মিলির পিঠ ছাপানো খোলাচুল, জানালার গ্রীলে রাখা সুডোল ফর্সা হাত। ওর বিষন্ন চোখের দৃষ্টি শফিকের অন্তর ছুঁয়ে যায়। কি করুণ আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে মিলিকে!

অমন তন্ময় হয়ে কি দেখছো মিলি?

কাঁধের উপর শফিকের অপ্রত্যাশিত হাতের স্পর্শে ভীষণ চমকে মুখ ফেরায় মিলি

– কে? ওহ্ তুমি?

– কি হলো অমন চমকে উঠলে যে? শফিক ডান হাতে মিলির কাঁধ বেষ্টন করে নিজের দিকে ফেরায়। মিলি মৃদুকণ্ঠে বলে–কোন দিন এমনি করে কাঁধে হাত রাখনি তো তাই।

– তার মানে? শফিক দারুন অবাক হয়! মিলি গাঢ় চোখে তাকায়।

– ও তুমি বুঝবেনা। এবার ছাড়ো তোমার চায়ের পানি শুকিয়ে গেল।

– আজ আর বাসায় চা খাবোনা চলো কোথাও ঘুরে আসি... বলতো কোথায় যাওয়া যায়? মিলি বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে।

– আরে অমন হা হয়ে গেলে যে, চলো চলো। বাপী, সুমীকে ডাকো, রেডি হয়ে নাও।

মিলি হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে। বিস্মিত হয়ে বলে,

www.pathagar.com

– তোমার আজ কি হয়েছে বলো ত? কোন কারণ ছাড়া হঠাৎ বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব? কোন মতলব টতলব নেইতো?

–এরমধ্যে মতলবের কি দেখলে? তোমাকে নিয়ে ঘুরবো এটা কি অন্যায়?

মিলি ঈষৎ আনমনা হয়।

অন্যায় হবে কেন? নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া তোমাকে আমাদের নিয়ে বেরুতে দেখিনি কিনা?... তাছাড়া মাসের শেষ... কোথাও যাওয়া মানে কিছু পয়সা বেরিয়ে যাওয়া। সখ–টখ রাখো আমি তোমার চা করে আনছি।

মিলি চুলার দিকে এগিয়ে যায়। শফিক দুহাত বাড়িয়ে বাধা দেয়। সবল আকর্ষণে মিলিকে কাছে টানে। চোখে চোখ রেখে বলে,

– সত্যি বলছি আজ তোমাকে নিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাপী সুমীকে পাশের বাসায় খালাম্মার কাছে রেখে গেলে হয়না?

– তোমার কি হয়েছে বলোতো? পাগল টাগল হওনিত?

– এতদিন পাগলই ছিলাম। এই মাত্র পাগলামীটা সেরে গেল। মিলির লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে শফিক উত্তর দেয়।

শফিকের আলিঙ্গন নিবিড়তর হয়। মিলি নিবিড় স্পর্শে কেঁপে ওঠে।

একান্ত স্বাভাবিক অথচ অপরিচিত অচেনা এক সুখে মিলির দেহমন উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। শফিকের বুকটা যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। দুজনার বুকের গভীরে ভালবাসার ছোট নদীটি তির তির করে বয়ে যায়।

এক সময় সে অনুভব করে মিলির চোখের পানি তার সার্ট ভিজিয়ে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

দেয়াল

হঠাৎ করে রেবার সাথে দেখা হয়ে গেলো নিউমার্কেটে একটি বই এর দোকানে। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের কখনো দেখা হবে ভাবিনি। আমার মেজমেয়ের একটি বই খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পাশের দোকানে ঢুকতে যাব এমন সময় রেবার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো। দোকান হতে বেরিয়ে আসছে রেবা। হাতে বড়সড় একটি প্যাকেট।

মুহূর্তের জন্য আমরা দু'জনেই থমকে গেলাম। আমাদের স্তম্ভিত নির্বাক দৃষ্টির উপর হতে বিশটি বছরের বিস্মৃতির কালোপর্দা সরে গেলো। স্কুল জীবনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রেবাকে চিনতে আমার অসুবিধা হয়নি। রেবা তেমনি সুন্দর নিটোল রয়ে গেছে।

ষোল বছরের রেবার চাইতে ছত্রিশের রেবার সৌন্দর্য্য যেন আরও বেশী প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমাকে চিনতে তার হয়ত একটু কষ্ট হয়েছে। সময়ের চেয়েও নির্মম যে সেই দারিদ্রের ছায়াপাতে হয়ত আমি কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছি। আমি ওর স্মৃতিকে সাহায্য করার জন্য মৃদু হাসলাম। রেবা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

– তোর হাসি দেখে চিনেছি। সেবু তুই ভাল আছিস? ওহ কতদিন পর দেখা?

আমি হেসে বললাম–ভাল। বিশ বছর তো হবেই। তা তুই কোথায় থাকিস? কেমন আছিস?

– আমিতো এতদিন চিটাগাংগেই ছিলাম। মাস ছয়েক হলো, ও ঢাকায় বদলী হয়ে এসেছে। ইস্কাটনে থাকি। আমাকে দেখে তোর কি মনে হয়? কেমন আছি?

আমি সহজ হেসে ওর আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে বললাম–

দাঁড়া বলছি। হ্যাঁ তোকে দেখে মনে হয় তোর বর খুব ভাল সেলারি পায়। আর বউকেও খুব যত্ন করে। এই বয়সেও তুই দারুণ সুন্দরী রয়ে গেছিস।

রেবা কৃত্রিম ভ্রুকুটি করে আমাকে মিষ্টি ধমক দিল–

www.pathagar.com

– থাম তোকে আর আমার বরের প্রশংসা করতে হবেনা। না দেখেই এত করছিস দেখলে কি করবি কি জানি।

ওর কথায় আমার মনে পড়ে গেলো আমাদের নামের মিল ও ঘনিষ্ঠতা দেখে স্কুলের অনেকেই ঠাট্টা করে বলতো–একই বরের কছে বিয়ে বসিস, তা নাহলে হার্ট ফেল করে মরবি তোরা।

সে কথার লেজ ধরে আমিও ঠাট্টা করে বললাম–ভয় নেইরে আমি মুগ্ধ হলেও তোর বর তোর মত রূপসী ফেলে আমার মত পেত্নীর দিকে ফিরেও তাকাবে না।

মুহূর্তের জন্য রেবার মুখের উপর কালোছায়া নেমে এলো। পরমুহূর্তে হেসে উড়িয়ে দিল।

– নিজের দাম আর বাড়াসনে, তুই যে ব্লাক ডায়মন্ড ছিলি সেটা ওকে আগেই বলা আছে। তোর বহু গুণের কথা শুনে শুনে একটু অনুরক্ত হয়ে আছে সেই কবে থেকে, জানিস,

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলা দৃষ্টিকটু। আমি বললাম–

–রেবু তোর বাসার ঠিকানা দে। তার আগে একটু অপেক্ষা কর বইটা নিয়ে আসি। দোকানে প্রবেশ করে সামান্য খুঁজে বইটা পেয়ে গেলাম। ফিরে এসে দেখি রেবা দূরে গেটের কাছে দাড়িয়ে আছে। আমি যেতেই ধরে ফেলল,

–সেবু চল আমার বাসায় চল।

– সেকি এখন কি বাসায় যাওয়ার সময়? অন্য দিন যাবো। আজ ঠিকানাটা দে বরং। রেবা নাছোড় বান্দা।

– না আজ তোকে ছাড়ছিনা। এখন সবে এগারোটা বাজে। দুটোর দিকে বাসায় ফিরলে হবেনা? সাহেব ফিরবেত সেই তিনটের সময়। তার আগেই বাসায় পৌছিয়ে দিলে হবে তো? চল...চল্ অমত করিসনে আর।

–রেবা একরকম জোর করে আমাকে ওর গাড়ীর কাছে টেনে নিয়ে গেলো।

ইস্কাটনে ওর মনোরম সাজানো গুছানো ফ্লাট দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। দেশী জিনিস দিয়ে ঘর সাজিয়েছে রেবা। বাঁশ, বেত, মাটির টব,

www.pathagar.com

মাটির ফুলদানী, শীতল পাটি ও নকশী কাঁথার বৈচিত্রময় আকর্ষণীয় সজ্জা। বাঁশের সোফা, গ্লাশটপ বাঁশের টেবিল, কুঁড়ে ঘরের আদলে তৈরী খড়ের ছাউনী দেয়া বাঁশ এবং কাঁচের তৈরী শোকেস। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

শোকেসের ষ্ট্যান্ডে ওদের যুগল ছবি দেখে এগিয়ে গেলাম। ওর বর? অত্যন্ত সুপুরুষ বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর চেহারা। সুন্দরের এমন সার্থক মিলন সচরাচর দেখা যায়না। রেবা বড় ভাগ্যবতী। রেবা আমাকে হাত ধরে অন্যান্য ঘরগুলোও ঘুরিয়ে দেখালো। ড্রইংরুমটাকে যেমন দেশীয় জিনিষ দিয়ে সাজিয়েছে ভিতরের ঘরগুলো ঠিক তার বিপরীত সজ্জা নিয়ে দৃশ্যমান। ঘরের চারদিকে তাকালে মনে হয় কোন বিদেশী ম্যাগাজিনের পাতা থেকে টুপ করে খসে পড়েছে বেডরুম, লিভিং রুম, বাথরুম ও ডাইনিং। রুমগুলো এত বেশী প্রাচুর্য্যময় যা আমার আশাতীত ছিল। রেবা এক ফাঁকে রান্না ঘরে গিয়ে খাবারের নির্দেশ দিয়ে এলো নিষেধ করা সত্ত্বেও।

রেবা বরাবর শান্ত স্বভাবের। এখন মনে হচ্ছে ও আরও শান্ত হয়ে গেছে। আলাপচারিতায় আমিই প্রধান। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জেনে নিলাম। রেবা আমার পাশে বসে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। এক সময় আমি বিরক্ত বোধ করলাম। যতটা উৎসাহ নিয়ে আমাকে বাসায় নিয়ে এসেছে কথাবার্তার বেলায় তার অর্ধেকও দেখা যাচ্ছেনা। ব্যাপার কি? ছবির মতো সাজানো বাড়ী দেখানোর জন্য এত জোর করে বাসায় ডেকে আনা? অপরের বিত্ত দেখে আমার যে চিত্ত চঞ্চল হয় না সেতো রেবার অজানা নয়। তবে? আমি তো পাথরের প্রাসাদ দেখতে আসিনি। অতিচেনা রেবার সাথে দু'দন্ড কাটিয়ে হারানো দিনের উত্তাপ পেতে এসেছি অথচ...। অস্বাভাবিক নীরবতা ভেঙ্গে আমি বললাম,

– আমি এখন যাই রেবা।

রেবা চমকে উঠে বলে– এ্যাঁ কি বলছিস যাবি? না–না আর একটু বোস।

–তখুনি ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে কাজের ছেলেটি ভিতরে এলো। খাবারের আয়োজন দেখে আমার চক্ষু ছানাবড়া–এ্যাতো খাবার কে খাবে? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

www.pathagar.com

- কেন তুই খাবি। না খেলে রাগ করবো।

রেবা উঠে প্লেটে খাবার সাজাতে লাগলো।

খাবারে রুচি ছিলনা। ওর পীড়াপীড়িতে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে উঠে পড়লাম। রেবা করুণ হয়ে বলল,

- সেবু তুই কথা দে আবার আসবি? আমি বড় একা সেবু।

ওর চোখের চাওয়ায় কণ্ঠস্বরে কি-যে ছিল আমি চমকে উঠলাম। এত করুণ দেখাচ্ছে কেন রেবাকে? রেবার হাত দুটি ধরে বললাম,

-রেবু তোর কি হয়েছে? সত্যিই কি তুই ভাল আছিস?

- ভাল।

রেবা তেমনি অন্যমনস্কতা নিয়ে জবাব দিল- হাঁ খুব ভাল। এত ভাল যেন কোন মেয়ে না থাকে!

আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

বাসায় ফিরে সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে রেবাকে ভাবলাম। ওর ঘর, বর, দুটি ছেলে মেয়ে। রেবা সবই পেয়েছে। একটি মেয়ের সারা জীবনের সুখ ওর হাতের মুঠোয়। সামান্য যা দুঃখ হবে হয়তো কোন দাম্পত্য কলহের জের। ভাবপ্রবণ মেয়েদের কাছে সামান্য মনোমালিন্য অসহনীয় মর্মপীড়ার কারণ হয়। এতো সুখে থাকার জন্য দুঃখের বিলাসীতা! কয়েকদিন রেবা আমাকে আলোড়িত করেছে। কিন্তু ওর বাসায় যাওয়ার সময় ও সুযোগ কোনটাই হয়নি। সীমিত আয়ে, দ্রব্যমূল্যের নিদারুণ অত্যাচারে প্রতিদিনের দিনযাপনই যেন দুঃসহ গ্লানির বোঝাটানা। এর মধ্যে বান্ধবীকে স্মরণ করতে গেলে বাজেটের ঘর টান পড়বে। তার চাইতে ভুলে থাকাই ভাল।

রেবা ভোলেনি। একদিন স্বামী ইমরানকে নিয়ে হাজির। একেবারে অকল্পনীয় ব্যাপার। খুশী হলাম তবে বিব্রতও কম নয়। ইমরান সাহেব চমৎকার মিশুক লোক। আমার গুরু গম্ভীর স্বামীকেও বেশ পটিয়ে ফেলেছে দেখছি। রেবা স্মিত হাসি নিয়ে বসে থাকে। ইমরান ছটফট করে। হো-হো করে সশব্দে হাসে-হাসায়। কিছুক্ষণের জন্য আমার ঘরটা আনন্দের কলতানে মুখর হয়ে ওঠে। এই ফাঁকে একটা ব্যাপার আমার নজর এড়ায়নি। ইমরানের রেবার

www.pathagar.com

প্রতি অপরিসীম মনোযোগ। ওদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় নতুন বিয়ে হওয়া স্বামী-স্ত্রী। আমার বুকে সূক্ষ্ম ঈর্ষার কাটা বেধে। এখনও এত? আমার হাতের তৈরী নাস্তা দুজনে খুব তৃপ্তি ভরে খেলো। আমার সকল খেদ দূর হয়ে গেল। আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও নিয়ে ওরা চলে গেল।

আমার স্বামী বললেন-একদিন ওদের ওখানে যেতে হয় দেখছি। ভদ্রলোক এত করে বললেন। আমি সায় দিলাম রেবার ছেলেমেয়ে দুটো হোস্টেলে থাকে। একজন ময়মনসিংহ গার্লর্স ক্যাডেট কলেজে পড়ে, অন্যজন ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজে। একা থাকতে থাকতে বড় চুপচাপ হয়ে গেছে রেবা। অথচ স্বামীটা এত প্রাণবন্ত।

এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে রেবা আর আসেনি। আমারও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ একদিন টেলিফোন এলো আমার স্বামীর অফিসে। রেবা অসুস্থ। আমাকে যেতে বলেছে।

দ্বিতীয়বার রেবার বাসায় গেলাম। গলা পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢেকে রেবা শুয়ে আছে। দু'চোখ বোজা রৌদ্রাহত শিউলী ফুলের মত ম্লান দেখাচ্ছে ওর মুখ। ইমরানকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছে। আমাকে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে।

আপনি এসেছেন? আহ্ আমায় বাঁচালেন। আসুন ওর পাশে বসুন।

রেবা চোখ খুলে আমাকে দেখে উঠে বসতে চাইল। আমি বাধা দিলাম।

-উঠতে হবেনা শুয়ে থাক। কি হয়েছে? দুহাতে জড়িয়ে ধরে রেবাকে শুইয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করলাম।

রেবা বলল- মারাত্মক কিছু হয়নি। ওর বাড়াবাড়ী । একটু ঠান্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। উত্তেজিত কণ্ঠে ইমরান বলে উঠল,

-বললেই হলো কিছু হয়নি? জানেন গত পাঁচদিন ধরে একশ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর? জ্বরে বেহুশ হয়েছে কয়েকবার। আজ জ্বর ছেড়েছে অমনি আপনার নাম করল।

-এত জ্বর ডাক্তার দেখান নি?

www.pathagar.com

– যে নিজের অসুখ গোপন করে তাকে কি করে ডাক্তার দেখাব? আমি মাত্র তিনদিন আগে জেনেছি। দিন দশেক আগে হতে জ্বর হচ্ছিল আমাকে জানায়নি। ডাক্তার যুবায়েরকে না পেলে কিযে হতো?

আমি অবাক হলাম । স্ত্রীর জ্বর অথচ স্বামী দশদিন টেরই পান নাই? একি করে সম্ভব?

ইমরান ছলছল চোখে বলল–ভাবী ওকে একটু বোঝান। আমার কথা না হয় বাদই দিলাম। ছেলে মেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে যেন এ স্বেচ্ছা মৃত্যু থেকে নিজেকে বিরত রাখে। আর দুটো দিন দেরী হলে চিকিৎসার বাইরে চলে যেতো।

রেবা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল–সেবু ওকে অফিসে যেতে বল, তিনদিন ধরে আমার পাশে বসে আছে। না ঘুম, না খাওয়া ওকে আজ একটু রান্না করে খাওয়া। তোর হাতের রান্না ওর পছন্দ খুব।

– বেশ তো খাওয়াব। তার আগে বল তোর কি হয়েছে? রেবা ইঙ্গিতে জানাল পরে বলবে।

বাড়ীতে কাজের লোকের অভাব নেই। তবু চারিদিকে সে দিনের সেই পরিপাট্যভাব আর নেই। ইমরানকে জোর করে অফিসে পাঠিয়ে রেবার কাছে এসে বসলাম একবাটি স্যুপ নিয়ে । রেবা শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে আকাশ দেখে তন্ময় হয়ে। আমি পাশে বসতে চমকে মুখ ফেরাল। রেবার চোখে অশ্রুর ক্ষীণ ধারা।

– অসুস্থ শরীরে কাঁদছিস কেন রেবু? ভয়কি দুদিনেই সেরে উঠবি? রেবা তার দুর্বল ডান হাতটি আমার কোলের উপর রাখল–আমি আর সুস্থ হতে চাইনে সেবু। এ জীবন রেখে কি লাভ? আমি নিজে কষ্ট পাচ্ছি। ইমরানকেও কষ্ট দিচ্ছি।

আমি সুপের বাটিটা হাতে তুলে নিলাম। এখন এসব কথা থাক। রেবা আগে এই স্যুপটুক খেয়ে ফেল দেখি।

www.pathagar.com

–নারে আমাকে বলতে দে। অনেকদিন চেপে রেখেছি বলার মত কাউকে পাইনি বলে। আজ আমাকে আর চুপ থাকতে বলিসনে! আমি বিব্রত হয়ে বললাম,

– যে কথা তোকে কাঁদায় সে আমি শুনতে চাইনে.. তবে তুই যদি বলে হাল্কা হতে পারিস তা হলে বল? কিন্তু আগে স্যুপটুক খেয়ে নে লক্ষিটি।

–সেবা তোর ত স্কুল ফাইনালের আগেই বিয়ে হয়ে যায়।

রেবা সুপের বাটি শেষ করে আধশোয়া হয়ে পিছনে বালিশে ভর দিয়ে বসে। আমার একটা হাত নিজে হাতে মুঠোয় নিয়ে খোলা জানালার ওপারে আকাশের নীলে দৃষ্টি ছড়িয়ে বলতে শুরু করে।

–আমি যখন কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি তখন ইমরানের সাথে পরিচয় হয়। ইমরান তখন বুয়েটের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। পরিচয় ধীরে ধীরে প্রেমে গড়ায়। দীর্ঘ ছয় বছরের প্রেমের পরিণতি বিয়ে। ওকে পেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে ভেবেছিলাম নিজেকে। সুখের ঘর বেঁধেছিলাম দু'জনে। সংগে ছিল আত্মীয় পরিজনের দোয়া। বিয়ের পর আমাদের ভালবাসায় কোন ঘাটতি ছিলনা। শোভন আর পপিকে নিয়ে আমাদের জীবন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। বলতে বলতে রেবার চোখ দুটো ভিজে উঠল। একটু চুপ থেকে বলল- সেবা ভালবাসা কাকে বলে? আমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে? কেন মনে হয় ভালবাসা বলে কিছু নেই, এতদিন যেটাকে ভালবাসা বলে ভুল করে আবিষ্ট হয়েছিলাম সে ভালবাসা নয়! শুধু পাশাপাশি বাস করা! গতানুগতিক দাম্পত্য প্রেমের মহড়া ছাড়া আর কিছু নয়! রেবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, আত্মা নয় দেহের আকর্ষণই কি ভালবাসা? তাহলে যে আমার সকল বিশ্বাসের ভিতটাই ভেঙ্গে যায়। ওভাবে আমি কখনো ভালবাসতে পারবোনা।

আমি রুমালে রেবার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম,

-রেবু কেন মিছেমিছি চোখের পানি ফেলিস? ইমরান তোকে ভালবাসে ..। তোকে সংসার দিয়েছে, সন্তান দিয়েছে।

www.pathagar.com

রেবা আমার কথায় কান না দিয়ে বলল- সেবু পৃথিবীতে কিছু কিছু মেয়ে জন্মায় যারা সারা জীবন শুধু ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসাই চায়। তারা ফাঁকি দিতে জানেনা। কেউ ফাঁকি দিলে সহ্যও করতে পারে না। আমি বোধ হয় সেই জাতের মেয়ে। সন্তানের মা হলেও স্বামীর প্রেমকেই বেশী মূল্য দিচ্ছি। আমার সন্তানেরা কেন আমাকে ধরে রাখতে পারে না? ইমরান আমাকে এমনই পাগল করে রাখল .....।

আমি রেবার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। রেবার দু'চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা রেখেছে। বন্ধ চোখের পাতা ভেদ করে অশ্রু গড়িয়ে নামছে। রেবার কণ্ঠ আমার নারীমন স্পর্শ করেছে। খুব বড় কোন আঘাত যা একমাত্র স্বামীর কাছ হতেই আসে মেয়েদের জীবনে। যে আঘাত একটি মেয়ের অন্তরাত্মাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। পৃথিবীটা জ্বালাময় শূন্যতায় ভরিয়ে দিতে পারে। তাই হয়ত রেবার জীবনে নেমে এসেছে।

আমি পরম স্নেহে রেবার চোখের পানি মুছে দিতে দিতে বললাম- রেবা তুই একটু শান্ত হ, একটু সময় দে ইমরানকে। রেবা আমার দিকে তাকাল।

-তুই কিছুই বুঝিস নি। শোন, একদিন আমরা দু'জনে পার্টিতে যাই। বিজনেসম্যানদের দেওয়া পার্টি। অনেক লোকজন। আয়োজনও তেমনি প্রচুর। পান এবং ভোজনের ব্যবস্থা। সঙ্গে গান মিউজিক ও ব্যান্ড দলের ব্যবস্থা। এতো লোকজনের ভীড় তার উপর গান বাজনার শব্দে আমার মাথা ধরছিল। তবু সময় কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। পার্টির মাঝামাঝি সময় ইমরান আমার পাশ হতে উঠে গেল 'একটু আসি' বলে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল ইমরানের পাত্তা নেই। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম বাসায় ফেরা দরকার। ভেকেশানে পপি শোভন দুজনেই বাসায় এসেছে। পপির জ্বর দেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফেরার কথা। অথচ ইমরানের সে খেয়াল নেই। কোকের গ্লাস হাতে হলরুম ছেড়ে বারান্দায় এলাম। এদিক ওদিক খুঁজে দেখি কোথাও নেই। কি মনে করে বাগানে নেমে আসি। সন্ধ্যা রাতের অস্পষ্ট আলো আঁধারিতে পাতাবাহারের ঝোপগুলোতে অন্ধকার গাঢ় হয়ে লেপ্টে আছে যেন। একটি ঝোপের কাছে কারা যেন খুব আস্তে আস্তে কথা বলছে। একজন

www.pathagar.com

মহিলা ও পুরুষ। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি পাশ কাটাতে যাব অমনি আমার অতিচেনা কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। সেবু মহাপ্রলয় কেমন হবে জানিনে। সেদিন আমার চোখের সামনে মহা প্রলয় যেন ঘটে গেল। ইমরানের বাহুর বাঁধনে যে মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে বুকে মুখ রেখেছে সে আমার চেনা। আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হাত হতে গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে গেল। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। আমি ছুটে পালাতে চাইলাম কিন্তু আমার পা পক্ষাঘাতে যেন অচল হয়ে গেল। যতবার পা তুলতে চাই ততবার হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছিল আমার শরীর। পা পাথরের মত ভারী ঠেকছিল আর আমি দেখলাম নরম মাটির ভিতরে আমার ভারী শরীর প্রথিত হয়ে যাচ্ছে। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠি। জ্ঞান ফিরতে দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি। ইমরান আমার মাথার কাছে বসে আছে। আমি হাসপাতালে আছি। সাতদিন পর জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান না ফিরলে ভাল হতো। আমার বুকভরা ভালবাসা ঘৃনায় রূপান্তরিত হতোনা।

রেবা ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজল। আমার বুকে তুমুল তোলপাড়। রেবার জীবনে ভাগ্যের এ কেমন পরিহাস। রেবার কষ্ট আমি বেশ বুঝতে পারি। এর চাইতে তীব্র কোন কষ্ট কোন মেয়ের থাকেনা। ওকে কি সান্তনা দেব? রেবা নিজেই আবার শুরু করল।

–সেবা তুই হয়ত বলবি এরকম অনেক ঘটে। সহজভাবে নে–ভুলে যা। আমি ভুলতে চেয়েছি। ইমরানের ক্ষমা প্রার্থনার কাতরতায় ক্ষমা করতে চেয়েছি। কিন্তু আমার শরীর.. আমার মন ওকে সহ্য করতে পারেনা। ওর স্পর্শ আমার ভিতর তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ওর আবেগের কথা শুনলে আমি অচেতন হয়ে যাই। অসহ্য লাগে নিজেকে ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করে। আমি ওর জীবন থেকে সরে যেতে চেয়েছি..ও দিল না। আমাকে ধরে রেখেছে ছেলে–মেয়ের দোহাই দিয়ে। আমাকে সুখী করার জন্য ও আপ্রাণ চেষ্টা করে এখন। সবই অর্থহীন, আমার কাছে। আমার জীবন আমার সংসার আমার প্রেম সব..সবই অর্থহীন আমি সেইদৃশ্য ভুলতে পারিনা। ইমরানকে ক্ষমা করতে না পারার কষ্টে আমি তিলে তিলে মরে যাচ্ছি। দু'বছর হয়ে গেল আমরা আলাদা ঘরে থাকি। আমি বুঝি এভাবে থাকতে ওর কষ্ট হয় কিন্তু আমি কি করব? আমি যে

www.pathagar.com

কিছুতে পারছিনা মানিয়ে নিতে। রেবার দুচোখে অবাধ্য অশ্রু আবার উপচে ওঠে।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটা কে ছিল? তুই চিনিস?

–এক বিজনেস ম্যানের ওয়াইফ। বছর তিনেক আগে আমাদের সাথে পরিচয়। ইমরানের সাথে পরিচয় বহু আগে থেকেই । ওর প্রাক্তন প্রেমিকা। মেয়েটি কলেজ লাইফে ওকে বিট্রে করেছিল। আমার সাথে পরিচয়ের পরে ওদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইমরান আহমেদকে দেখে সে প্রলুব্ধ হয়। বড় ব্যবসায়ীর স্ত্রী। খোলামেলা আচরণে সে অভ্যস্ত। আর ইমরান নাকি তার প্রেমের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। এভাবে ওকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে..ওরটা নাকি ছিল স্রেপ অভিনয়...। আমাকে এক গ্লাস পানি দেতো গলাটা শুকিয়ে গেছে।

ঢক্ ঢক্ করে গ্লাসের পানি শেষ করে আমার দিকে উদভ্রান্তের মতো তাকাল রেবা। খুব ত বলতিস আমি এত সুন্দর, আমার বর আমার রূপে পাগল হয়ে থাকবে। আমার কাহিনী শুনে এখন কেমন লাগছে তোর? রেবা খিল খিল করে হেসে উঠল। আমি ভয় পেয়ে ওকে নাড়া দিলাম।

–কি পাগলের মত হাসছিস? শোন ইমরান কি মেয়েটার প্রতি এখনও দুর্বল?

– না ওর নামই শুনতে পারেনা। মেয়েটা আরও অনেকের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল।

রেবার হাত দুটো কোলের কাছে টেনে নিয়ে আমি খুব সতর্কভাবে বললাম, রেবু সব শুনে মনে হোল ইমরান লোকটা খুব বেশী খারাপ না। মুহূর্তের ভুলে যা ঘটে গেছে তুই তা ক্ষমা করতে পারিসনা, ও অনুতপ্ত। তোর কাছে আশ্রয় চায়। পপি শোভনের কথা ভাব একবার। ওরা কি দোষ করেছে?

–আমার ভালবাসা আমার বিশ্বাস কি দোষ করেছিল রেবা? ঘুণাক্ষরেও কোনদিন বুঝতে দেয়নি আমি ছাড়া আর কেউ ওর জীবনে এসেছিল! কেন এতবড় প্রতারণা করল আমার সাথে?

রেবা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুফিয়ে কেঁদে ওঠে –না আমি আর কোনদিন ওর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে পারবোনা, আমাদের দুজনের মাঝখানে চিরদিন ও ঘটনাটা অনতিক্রম্য দেয়াল হয়ে থাকবে যা আমি কখনো ডিঙ্গাতে পারবোনা কোন দিন, না!!.... ।

www.pathagar.com

দেয়াল

লেখিকা জাহান আখতার নূরের প্রথম গল্পগ্রন্থ। তবু এই গল্পগুলোর মধ্যে চমৎকার এক প্রাণের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। এর অধিকাংশ গল্পে নারী জীবনের সুখ-দুঃখ অঙ্কিত হয়েছে অতি মমতার সাথে। নারী জীবনের কথিত-অকথিত হাসি-কান্না, বেদনার নির্ঝর বয়ে গেছে এ গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে। ছোট-খাট ভুল ত্রুটি বাদ দিলে গল্পগুলো ভালো লাগবারই কথা। গ্রন্থটি পাঠক হৃদয়ে সামান্য পরিতৃপ্তির ছোঁয়া দিতে পারলেই আমরা আমাদের এ প্রয়াসকে সার্থক বলে মনে করব।

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com